অনেক সুর

দক্ষিণারঞ্জন বসু

॥ এভারেস্ট বুক হাউস । কলিকাতা-৩০ ॥

প্রকাশক :
বিভূতিভূষণ ঘোষ
এভারেস্ট বুক হাউস :
৯৪, সাউথ সিঁথি রোড,
কলিকাতা-৩০

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রচ্ছদশিল্পী : মৈত্রেয়ী দেবী

মুদ্রক :
রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস :
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড,
কলিকাতা-৩৭

মূল্য : তিন টাকা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রীতিভাজনেষু ॥

বুধুর মা

পটুয়া

নাগ বাসুকি

আচার্য পীঠ

আশ্রয়

জনগণেশ

এই লেখকের কয়েকখানি বই

শতাব্দীর সূর্য
ছেড়ে আসা গ্রাম (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
বিদেশ বিভূঁই
স্বপ্নকোরক
সুভদ্রার ভিটে
বাজীমাৎ
পরম্পরা
রোদ জল ঝড়
লাইলাক একটি ফুল (যন্ত্রস্থ)
রেডউড (যন্ত্রস্থ)
বীরবাহাদুর
পেনাঙের পাহাড়ে

বুধুর মা

এটা ঠিক উদ্বাস্তু কলোনী নয়। দেশ ভাগ হবার আগেরই এ একটা বস্তি। বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের নিঃস্ব মানুষের এক একটি দল দফায় দফায় এখানে এসে ঘর বেঁধেছে অনেকদিন ধরে। এমনি করেই এ বস্তির সৃষ্টি। বস্তিবাসীদের ধারণা, মহানগরীর কোলে যখন একবার এসে তারা আশ্রয় পেয়েছে তখন আর না খেয়ে মরতে হবে না তাদের। কিন্তু সে কি তাদের ঠিক ধারণা? মৃত্যু যে তাদের বড্ড বেশি ভালবাসে।

মৃত্যুর চেয়েও যে এ দৃশ্য আরো ভয়ংকর।—সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাইরে পা দিয়েই পাগলিটা চিৎকার করে ওঠে। গেটের পাশে বসে থাকা ছোট্ট কংকালসার একটি মেয়েকে পাহারা দিতে থাকে তার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে।

বুধুর মা ঠিক পাগলি নয়। বড়ো জোর আধপাগলি বলা যায় তাকে। যতো পাগলামিই সে করুক না কেন, সময় সময় এমন সব কথা সে বলে যা তারিফ না করে পারে না কেউ।

তবে তার অবিরাম বক্‌বকানি সকলেরই অসহ্য, বুধুর মাকে নিয়ে এই হলো মুস্কিল। তা না হলে তার কাজের, তার চরিত্রের প্রশংসা সকলের মুখে মুখে। ওর মাথাটা হঠাৎ এমনি খারাপ হয়ে গেলো, সেজন্যে সবারই ভীষণ দুঃখ।

সত্যি কথা, ঠিকে-ঝি হিসেবে বুধুর মা'র তুলনা ছিলো না। আশপাশের ভদ্দর লোকদের সব বাড়িতেই তাকে নিয়ে টানাটানি। এতো বিশ্বাসী, এমন মমতাময়ী ঝি যে দুর্লভ একালে। কিন্তু একা আর কয় বাড়িতে কাজ করা সম্ভব এক সঙ্গে? তাই বড়ো

জোর চার-পাঁচটি কাজ হাতে রেখে আর সব জানাশুনো ঘরে তার পরিচিতদের এক এক করে কাজে বসিয়ে দিয়ে তবে বুধুর মা'র অব্যাহতি। তার দেওয়া লোক পেয়ে তবু একটু নিশ্চিন্ত থাকা যায়। যে দিন কাল।

এমনি করেই বুধুর মা আপন জন হয়ে উঠেছে বাড়িতে বাড়িতে। তার বড়ো আদরের পাড়ার যতো ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে। তারাও সবাই ঘরের লোকের মতোই ভালোবাসে বুধুর মাকে।

সেই বুধুর মা'র মাথাটা কেমন করে এমনি বিগড়ে গেলো সে কথা ভেবে সকলেরই যে দুঃখ হবে সে তো জানা কথা। তবে তার এ অবস্থার কারণ কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় বুধুর মা'র দিনরাতের বকুনির মধ্যেই।

ভোরের কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে বুধুর মা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আর ঘরে ফেরে রাত দুপুরে। সারাক্ষণ ধরে রাস্তাটার পুব-পশ্চিমের এমাথা সেমাথা হাজার বার করে ঘোরাঘুরি। তার মধ্যে এ বাড়ি সে বাড়ি দু'চার বার ঢু মেরে আসাও তার নিত্যকার কাজ। কখনো সখনো দু' একটা টুকরো কাজও হয়তো সেরে দিয়ে আসে অভ্যাস বশে। পরিষ্কার করে বলে দিয়ে আসে গিন্নী-মাদের, সখা বায়েনের মেয়েকে বাঁধা মাইনের ঝি করে রাখবে এমন আশা করো না কেউ।

মেদিনীপুরের সখারাম বায়েন আর তরংগিনীর মেয়ে পংকজিনী, একথা দিনে হাজার বার শুনে শুনে পাড়ার লোকের কান ঝালাপালা। তার বাপ-মা'র কাহিনী নিয়ে কখনো কীর্তনের সুরে, কখনো বা রামপ্রসাদী সুরে গান গেয়ে আবার কখনো কখনো যাত্রার ভংগিতে আপন রচনা আবৃত্তি করে অপরিচিত পথিকদের অবাক করে দেয় বুধুর মা। তার বাপ-মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে কি আর এমনি করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে

বেড়াতে হতো তাকে? দু'মুঠো ভাতের জন্যে এ বাড়ি সে বাড়ি গিয়ে ভিখারীর মতো কাতর চোখের প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়াতে হতো? না তাঁরা দিতেন পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করতে? অবশ্য এতোকাল ধরে নিজের জন্যে ঝি'র কাজ করেনি বুধুর মা। করেছে স্বামী-পুত্রের জন্যে। একটা পেট হলে সে তো অনায়াসেই অতি আদরে মামা বাড়িতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু একটা একটা করে পেট তো তিনটে। এই তিন পেটের দায় সে মামার ঘাড়ে গিয়ে চাপাবে কোন্ মুখে? বাপ-মা যার হাতে দিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন সেই জোয়ান-মর্দ ঠিক মতোই চালিয়ে নিতে পারবে সংসার। কিন্তু তাঁদের সেই আশায় ছাই। ঘরামির কাজে কতোই বা আর পয়সা। কোনোদিন কাজ আছে, কোনোদিন ঠায় বসা। তার ওপর আবার মিন্‌সে তিন্নাথের ভক্ত—নিত্য সন্ধ্যায় সিদ্ধি-গাঁজায় মশগুল্। সেই নেশার ধকলই কি কম সইতে হয়েছে বুধুর মাকে। মার খেয়ে খেয়ে কালশিরায় ছেয়ে গেছে তার সারা শরীর। বছরের পর বছর সবই সে সহ্য করে গেছে ঐ একটা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে এবং বিশেষ করে তারই জন্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঝি-এর কাজ করতে পেছ-পা হয়নি কোনোদিন। ছেলে লেখাপড়া শিখে বড়ো হবে, মা-বাপের দুঃখ-কষ্ট ঘোচাবে, এইতো ছিলো তার একমাত্র চিন্তা—একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সে সব আশা-ভরসা। লেখা পড়া সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ছেলে তার এখন বাপের সাকরেৎ হয়েছে সিদ্ধি-গাঁজার। গাঁজায় দম দিয়ে মাকে মারতে তারও কি কম আনন্দ! এর পরেও বুধুর মা আর পরের বাড়িতে ঝি খাটতে যাবে কোন্ সুখে? সে তাই একই দিনে পাঁচ বাড়িতে কাজে ইস্তফা দিয়ে খালাস হয়েছে পুরোপুরি।

এ সব কথাই বুধুর মা গেয়ে গেয়ে ফিরে রাস্তায় রাস্তায়। কখনো বা যাত্রার পার্ট শুরু করে কোনো একটা প্রসংগ নিয়ে।

রামায়ণ-মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সে প্রমাণ করে দেয়, বাপ-মা সাক্ষাৎ দেব-দেবী। বাপ সখারাম বায়েন আর মা তরংগিনীকে তেমনি ভাবেই দেখতে শিখেছিলো পংকজিনী। কিন্তু তার ছেলে এমনতরো হলো কেমন করে? তার গোপাল মায়ের গায়ে হাত তুলতে একটুও কেঁপে ওঠে না, এ কি করে সম্ভব? যে মা গোপাল ছাড়া বুধু বলে ডাকেনি কোনোদিন সেই মাকে মারধর, এমন পাষণ্ড ছেলে। এই দুঃখেই তো বুক ফেটে যায় বুধুর মা'র, মাথার যন্ত্রণায় এক এক সময় অস্থির হয়ে পড়ে সে।

মা, আপনার যেন প্রথম সন্তান মেয়েই হয়।—ঠিক দুপুর বেলা লোকেন বাবুর ঘরে ঢুকে পড়ে তাঁর গৃহিণীকে শুভকামনা জানায় বুধুর মা। বলে, আমার গোপাল ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হতো তা'হলে কি আর এতো দুঃখ ভোগ করতে হতো আমায়? সবই আমার কপাল, সবই অদৃষ্ট।—এই বলে তার কতো আফশোষ, কতো অনুশোচনা।

এই লোকেন বাবুর ঘরেও কাজ করতো বুধুর মা। অন্য সব বাড়ির মতো এখানকার কাজেও সে ইস্তফা দিয়ে বসে আছে। 'তবে কাজ ছাড়লেও, এ বাড়ির মা-বাবাকে ছাড়তে পারবো না বাবা।'—সেই যে চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিবার দিন বলে গিয়েছে বুধুর মা, সেই থেকে একদিনের জন্যেও এ বাড়িতে আসায় তার কামাই নেই।

রোজ ঠিক দুপুর বেলা দরজায় টোকা পড়লেই বুঝতে হবে বুধুর মা এসেছে। দরজা খুলতে দেরি হলে বা ইতস্তত করা হলে অমনি গলা ফাটানো গান শুরু হয়ে যাবে বাইরে—'মা হওয়া কি মুখের কথা, সোজা নয় সন্তানের ব্যথা'।

কি জানি কি আবার বলে পাগলি। কিসে কি হয়ে বসে কে বলতে পারে। পেটের বাচ্চাটার কথা মনে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দেন লোকেন বাবুর স্ত্রী। তারপর আরম্ভ হয়ে যায় যতো

রাজ্যের গল্প। তার কতোগুলোর হয়তো অর্থ হয়—এমন কি কোনো কোনো গল্প হয়তো সত্যি সত্যি মহৎ অর্থপূর্ণ, বাকি সব কথা একেবারেই অর্থহীন এবং বাজে। তবু সব কথাই শুনতে হয় লোকেন বাবুর স্ত্রীকে, অন্তত 'হ্যাঁ, হুঁ' করতে হয় মাঝে মাঝে। তা' নইলে যে আবার ক্ষেপে উঠবে পাগলি।

মা, পুজো তো আবার এলো। আমায় এবার কি রঙের শাড়ি দেবেন?

দেখো না আব্দার, কাজ ছেড়ে দিয়েও তার আবার পুজোর কাপড় চাই।

বেশ আমিও দেখবো, মেয়েকে বাদ দিয়ে মা কি করে পুজোর দিনে নতুন শাড়ি পরে—আমিও দেখে নেবো। পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াবো, তখন বেশ ভালো লাগবে, তাই না?—বুধুর মা'র সঙ্গে তর্কে এঁটে ওঠা কি সহজ ব্যাপার। লোকেন বাবুর স্ত্রী তাই আর কথা না বাড়িয়ে একখানা সবুজ রঙের শাড়ি দেবার আশ্বাস দিয়ে ঠাণ্ডা করেন তাকে।

সস্তায় কেনা হাওড়া হাটের একটা লাল এবং আর একটা নীল শাড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রোজ পরে বেরোয় বুধুর মা। অবশ্য এর কোনোটাই তার নিজের কেনা নয়, বাবুদের বাড়ি থেকে পার্বণী পাওয়া শাড়ি। কিন্তু এবার তো আর কোনো বাড়ি থেকেই কিছু পাওয়ার আশা নেই। এবার যে সে বেকার। সেদিকে পুরো খেয়াল আছে বুধুর মা'র। অন্তত একখানা শাড়ির ব্যবস্থা করে রাখতেই হবে তাকে আগে থেকে। সে জানে এ বাড়ির গিন্নী-মা না বলতে পারবেন না কিছুতেই। আর মা না বললে বাবু আছেন না। তাঁকে তো কোনো কিছুর জন্যে ধরলেই হলো—অমনি মঞ্জুর।

বুধুর মা আস্তে আস্তে এতোখানি আধিপত্য বিস্তার করে বসেছে লোকেনবাবুর বাড়িতে। কোনোদিন এটা ওটা কিছু কাজ

করে দিয়ে, কোনোদিন বা কিছু না করেই প্রায় নিত্য তার দুপুরের খাওয়াটা সে সেরে নেয় এ বাড়িতেই। তার জন্তে রোজ প্রস্তুত থাকতেই হয়।

একদিন তো জোর গলায় স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে বুধুর মা— মা-বাবার কাছে চেয়ে খাবো কেন? মা'র পেটের মেয়েটা যদি পাঁচ-দশ বছর আগে জন্মাতো, তাকে কি চেয়ে খেতে হতো এ বাড়িতে? না মা-বাবাই সব সময় ডেকে ডেকে খাওয়াতেন তাকে? তবে, তবে আমিই বা চাইতে যাবো কোন্ দুঃখে? আমি বুঝি আর এ বাড়ির মেয়ে নই?

এমনিভাবেই দিন কাটে বুধুর মা'র। একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ কার মুখে যেন সে শোনে, লোকেনবাবুর স্ত্রীর মেয়ে হয়েছে আগের রাত্রিতে হাসপাতালে। আর অমনি সে কী তার চিৎকার!—আমার মায়ের ঘরে লক্ষ্মী এসেছে, কী আনন্দ! আমার পেটে গোপাল এসেছিলো না হাতি! ওটা দানব। ওটা দত্যি— ষষ্ঠ অবতার। বাপের কথায় মা'র গলা কেটে হাতে কুড়োল আটকে রয়েছিলো না পরশুরামের! আর পরশুরামের মায়ের মতো অসতী মা নই আমি। আমার মতো মায়ের গায়ে হাত দেওয়া। এই পাপে আমার পাষণ্ডের আবার কী হাল হবে কে জানে! অনেক তপস্যায় মুক্তি পেয়েছিলেন পরশুরাম। কিন্তু আমার শ্রীমান তো আর পরশুরাম নয়। ওকে ভগবান রক্ষা করলেই তবে রক্ষা! তাই করো ভগবান!—পাষণ্ড পুত্রের জন্যেও ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় বুধুর মা।

এক সপ্তাহ পার করে হাসপাতাল থেকে ঘরে ফেরেন লোকেনবাবুর স্ত্রী। কোলে টুকটুকে একটি মেয়ে।

বুধুর মা সেই সকাল থেকেই আজ হাজির। লোকেনবাবুর প্রায় অন্ধ অথর্ব বুড়িমা'র কাছ থেকে সে আগের দিনই জেনে নিয়েছে গিন্নীমা'র হাসপাতাল থেকে ফেরার তারিখ, সময় সব

কিছু। সেই সাত সকালে সেই যে সে শুরু করেছে ধোয়া মোছা, এতোক্ষণে তার নিবৃত্তি। ঘরদোর সব ফিটফাট।

ঘরে আজ লক্ষ্মী দেবী আসবেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-পবিত্র পরিবেশ চাই।—সকাল থেকেই এই একই কথা আজ বার বার বলে চলেছে বুধুর মা।

বুড়িমা কিন্তু তেমন খুশি হতে পারেন না'র বুধুর মা'র কথায়। তিনি যে আসলেই অখুশি। নাতনির নয়, নাতির মুখ দেখে বিদায় নেবেন সংসার থেকে, এই ছিলো তাঁর আশা। কিন্তু তা আর পূরণ হবার নয়। বিয়ের আট বছর পর ছেলের ঘরে এই প্রথম সন্তান। আবার কতো বছর পর কি হবে, তার আবার কী ভরসা! তাই বুড়িমা'র মনে দুঃখ। অবশ্য মুখ ফুটে কখনো তিনি বলেন নি তেমন কিছু। কীই বা আর বলবেন? যে এসেছে তাকে তো সাদরে বরণ করে নিতেই হবে।

বুধুর মা কিন্তু বুড়িমা'র মনের খবর টের পেয়েছিলো ঠিক ঠিক মতো। তাঁর হাবভাব দেখেই ধরতে পেরেছিলো। তাই তাঁকে বলছিলো ঘর মুছতে মুছতে—মানুষের মনে যতো আশা তার কতোটুকুই বা আর পূরণ হয় ঠাকুমা। এই আমার কথাই ধরুন না, কতো কি ভেবেছিলাম আর কী হয়ে গেলো!

ঠিকই বলেছিস পংকি, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুটা ভুলে থাকার জন্যেই আশার ছলনা। ও সত্যি কিছু নয়, কিছু নয়।—পংকজিনী নামটাকে একটু সংক্ষিপ্ত এবং সহজ করে নিয়ে বুড়িমা পংকি বলেই ডাকেন বুধুর মাকে।

বুড়িমা ও বুধুর মা'র মধ্যে যখন এ ধরনের কথাবার্তা হচ্ছিলো ঠিক তখনই বাড়ির গেটে মোটর গাড়ির হর্ণ। হাতের কাজও ঠিক তখনই শেষ হয়েছে বুধুর মা'র। গাড়ির হর্ণ শুনেই সে নিচে চলে যায় এক দৌড়ে। ঝাপটে ধরে ধীরে ধীরে ঘরে তুলে নিয়ে আসে মা ও মেয়েকে একসঙ্গে।

দুধারের প্রায় সব ফ্ল্যাটের বউ-ঝিরাই এসে দেখে যায় নবজাত শিশুকে। সবাই প্রশংসা করে মেয়েটির টুকটুকে রঙ্ আর তার সুন্দর গড়নের। বুধুর মা'র মন খুঁৎ-খুঁৎ এ সব অনাবশ্যক প্রশংসার জন্যে। 'চোখ লাগবার ভয়' সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয় সে খুকুর মাকে।

আজ সকাল থেকেই বুধুর মা যে ভাবে কথাবার্তা বলছে তারপর কে আর তাকে পাগলি বলবে ?

বাড়িতে ঠাকুরের রান্নার ব্যবস্থা রয়েছে, খুব ভালো কথা। কিন্তু পোয়াতির রান্নার ব্যাপার ঠাকুর কী করে জানবে, বলুন তো ঠাকুমা। ওজন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না, আমিই সব ঠিক করে দেবো।—এ পাগলের মুখের কথা নয়, সত্যি সত্যি বুধুর মা এক হাতেই সব কিছু জোগাড়-যন্ত্র করে খুকুর মাকে খাইয়ে দাইয়ে তবে নিশ্চিন্ত। তারপরে সে যখন খেতে বসে তখন আবার তার মুখে ফুলঝুরি।

আচ্ছা বুধুর মা, তুমি তো বলো বুধুর বাবা তোমায় মারধর করে, তোমায় নানারকমে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু তোমার কপালের সিঁদূর কোঁটাটা তো দেখছি ক্রমেই বড়ো হয়ে চলেছে। এ দেখে তো মনে হয়, স্বামীর ওপর তোমার অসীম ভক্তি।

এ কি বলছেন মা, তা হবে না ? ওরকম কথা মুখে আনতে নেই, পতি পরম গুরু !—বলেই দু'হাত জোর করে মাথায় ঠেকায় বুধুর মা। তারপরে আবার বলে চলে :

ত্রেতা যুগে কি কম লাঞ্ছনা দিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র সীতা মাকে। কিন্তু সব দুঃখই সয়েছেন সীতা মা মুখ বুজে। আমিও সীতা মায়ের মতোই নীরবে সহ্য করে চলেছি সমস্ত রকম লাঞ্ছনা গঞ্জনা। আমার ধর্ম আমার কাছে, ওর ধর্ম ওর। আমার কপালের সিঁদুরের কৌটা ছোটো হবে কোন্ দুঃখে, বড়ো হয়

হোক—অন্তত যেমন আছে তেমনটি থাকবেই।—বলতে বলতে একটু উত্তেজিত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে পাগলি।

না, না, বুধুর মা, আমি তো আর কিছু বলিনি—শুনতেও চাইনি তোমার এতো কথা। তুমি বুধুর বাপের মারধরের কথা বলো, কিন্তু তোমায় দেখে আমার তো কেবলি মনে হয় সে বেচারা তোমাকে খুব ভালোবাসে।

শোনো মা'র কথা। মা যে কী বলেন।—বলেই এক ঝলক হেসে ফেলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় বুধুর মা। তারপর খুকুর মা'র কথার সোজা জবাব দেয়—কেন সীতা মাকে তো অতো কষ্ট দিতেন রামচন্দ্র, তিনি ভালোবাসতেন না সীতাকে? কোন্ সোয়ামীই বা তার স্ত্রীকে ভালো না বাসেন? তবে একটা কথা কি জানেন মা, লব-কুশের মতো ছেলে পেয়েছিলেন বলেই অনেক কম দুঃখ নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পেরেছিলেন সীতা মা। আর আমার বেলা কি হবে? আমার পাষণ্ড ছেলেটার চিন্তায় একখানা ঝাঁজরা পোড়া বুক নিয়ে আমাকে চলে যেতে হবে এই সংসার থেকে।—বলেই আপন বুকে দুই চাপড় বসিয়ে দেয় বুধুর মা

খুকুর মা দেখেন এতো ভারি মুস্কিল। তিনি তখুনি কথাটা ঘুরিয়ে নেন অন্যদিকে।

তুমি যাই বলো বুধুর মা, ঐ বড়ো সিঁদুর ফোঁটায় ভারি সুন্দর মানায় কিন্তু তোমাকে। এ যেন ঠিক ভোর বেলার নীল আকাশের সীমন্তে লাল টুকটুকে সূর্যশোভা।

ঠিক বলেছেন মা, ভোরের আকাশের সূয্যিঠাকুরের মতোই আমার কপালের এই সিঁদুর ফোঁটা। আশীর্বাদ করবেন, যেন এই সিঁদুর ফোঁটা রোজ সকালে আপন কপালে বসিয়ে যেতে পারি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সূয্যিঠাকুরের মতোই যেন অক্ষয়-অমর হয়ে থাকে এই সিঁদুর বিন্দু।—এই বলতে বলতে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে বুধুর মা। তখন বেলা প্রায় তিনটে।

ঘণ্টা দুই বিশ্রামের পর আবার কাজকর্ম শুরু হয় ঘরে ঘরে। বুধুর মা আজ আর লোকেনবাবুর বাড়ি থেকে একটি বারও বেরোয় নি রাস্তায়। রোজ যারা তাকে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে দেখতে অভ্যস্ত তারা বার কয়েক বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে, পাগলি কি তাহলে মামা বাড়িই চলে গেলো নাকি শেষ পর্যন্ত!

মামাবাড়ি যে বুধুর মা চলে যায়নি পাড়ার লোক তা সঠিকভাবে জানতে পায় প্রাক্ সন্ধ্যায়। সবে খুকুর মা'র চুল বাধা শেষ করে উঠেছে বুধুর মা, আর অমনি একটা কান্নার রোল ওঠে সামনের বস্তিতে।

এই রে, ভোলার বাপটা চলে গেলো বুঝি! ঐ আর একটা হতভাগা ছেলে। কতো কষ্ট করে বাপ বড়ো করলো ভোলাটাকে, আর ঐ হতচ্ছাড়া ছেলে কিনা বিয়ে করেই ভাত দেওয়া বন্ধ করলে বুড়ো বাপকে! মেয়েই ভালো গো মা, মেয়েই ভালো—মেয়ে লক্ষ্মী।—এই বলে ছুটতে ছুটতে বুধুর মা সিঁড়ি ধরে নেমে যায় নিচের দিকে।

কী বীভৎস! মৃত্যুর চেয়েও এদৃশ্য যে আরো ভয়ংকর!—দোতলা থেকে নেমে এসে বাইরে পা দিয়েই পাগলিটা চিৎকার শুরু করে দেয় পটলির দুই-আড়াই বছরের মেয়েটাকে এক ঝাঁক কাকের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে। না খেয়ে খেয়ে মেয়েটা একেবারে কংকালসার। কাকের হাত থেকে ওকে বাঁচাবার জন্যে ওর পাশে পাহারা দাঁড়িয়ে যায় বুধুর মা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুধুর মা ভাবে, বাঁচাতে হবে পটলির এই বাচ্চাটাকে। পটলি বাঁচাতে পারবে না, আমাকে নিতে হবে ওর ভার। ভোলার বাপের মৃত্যুর চাইতেও ওর অবস্থা যে আরো শোচনীয়। আরো দুঃখের। জীবনের ভালো-মন্দ বোঝবার সুযোগটুকু পাবে না মেয়েটা, তা হতেই পারে না।

বস্তির কান্নার রোলটা হঠাৎ আরো বেড়ে ওঠে। ওপরের

গিন্নীকে অনেক বলে-কয়ে পটলিও চলে আসে নিচে নেমে। ব্যস্, আর যাবে কোথা? পড়তো পড় একেবারে বুধুর মা'র মুখোমুখি।

বলিহারি তোর চাকরি। পেটের সন্তানটাকে কাকে ঠুক্‌রে মেরে ফেলছে আর উনি চাকরি করছেন। এর চেয়ে পদ্মার ওপারে মুসলমানের হাতে দু'খণ্ড হয়ে মরাই তোর ভালো ছিলো। —উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে এতোগুলো কড়া কড়া কথা পটলিকে অনায়াসেই শুনিয়ে দেয় বুধুর মা।

শুধু কথা শুনিয়েই ক্ষ্যান্তি নেই, সরাসরি সে আবার একটা প্রস্তাবও পেশ করে বসে পটলির কাছে।

দিবি, তোর মেয়েটাকে পুষ্যি দিবি আমাকে? তুই তো ফেলেই দিয়েছিস মেয়েটাকে, তার চেয়ে আমায়ই দে। দেখি এটাকে মানুষ করে তুলতে পারি কিনা। আরে ছেলের চেয়ে মেয়েই ভালো। পরের ঘরে ঝি-গিরি করে ঐ যে দু'টো ছেলেকে পুষছিস না, দেখবি বড়ো হয়ে ওদু'টো কি রূপ ধরে। আর একরত্তি এই লক্ষ্মী মেয়েটাকে তুই রাস্তায় ফেলে রাখিস। অলক্ষ্মী কোথাকার!—বুধুর মার গালাগাল খেয়ে থ' বনে যায় পটলি। মাথা গরম মানুষ, তার সঙ্গে তর্ক তো আর করা চলে না, কিছু বলে জবাব দিতে গেলেই বিষম রকমের একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়ে যাবে। তার দরকার নেই কিছু। তার চেয়ে বরং বুধুর মা'র কথায় সায় দিয়ে যাওয়াই ভালো।

আর এই বুধুর মা-ই তো পটলিকে এই কাজটা জুটিয়ে দিয়েছে। রাত-দিনের কাজ হলেও পঁচিশ টাকা মাইনে এবং খাওয়া-পরা সব, এ কি কম কথা! আর একটা বড়ো কথা, দু'বেলাই নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। খাওয়ার পাট তাড়াতাড়ি সেরে ফেলার জন্যে এ ব্যবস্থা গিন্নীর হুকুম মতো করা হলেও এতে পটলিরই সুবিধে। বাড়িতে কিছু চাল সিদ্ধ করে রাখলেই হয়,

নুন-লঙ্কার ওপর তার নেওয়া বেগুন-ব্যাঞ্জনেই সকলের কোনো-রকমে চলে যায়।

যে বুধুর মা'র সাহায্যে তারা যা'হোক করে খেয়ে-পরে বেঁচে আছে তার সঙ্গে ঝগড়া করার কথা ভাবতেই পারে না পটলি। শুধু তো তাদের জন্যেই নয়, দেশ ভাগ হবার পর এই 'কানা রাজার বস্তিতে' তারা কয়েক ঘর উদ্বাস্তু যখন এসে বসেছিলো তখন অনেকেই এখানকার মারমুখো হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু এই বুধুর মা তার আরো কয়জন সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে তখন রুখে দাঁড়িয়েছিলো এই সব মারমুখো স্বার্থপর মানুষগুলোর বিরুদ্ধে। ভলান্টিয়ার ডেকে এনে, পাশের শ্যামপুকুর থানা থেকে পুলিশ ডেকে এনে বস্তির আবহাওয়া ঠাণ্ডা রেখেছিলো। বুধুর মা'র তখনকার একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে পটলির। সে বলেছিলো, গরীব হয়ে গরীবের দুঃখ যারা বোঝে না বড়ো গলায় বড়োলোকদের দোষ দেওয়া তাদের মুখে শোভা পায় না।

পটলি সে কথা ভুলতে পারে না। পরম আত্মীয় বলেই বুধুর মাকে মনে করে সে। পরিচয়ের প্রায় শুরু থেকেই তাকে ঠাকুর্ঝি বলে ডাকে।

বেশ তো, মেয়ে তার পিসির কাছে থাকবে, পিসিকে মা বলে ডাকবে, তাতে আমার আবার হ্যাঁ-না বলার কি আছে। তুমি তো সবই জানো ঠাকুর্ঝি, মেয়েটাকে ওপরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম নেই। পাছে গিন্নীর কোলের ছেলেটা আমার মেয়ের হাওয়া লেগে আবার খারাপ হয়ে যায় তাই এ নিষেধ।

জানিলো সবই জানি। তাই বলে তুই বুঝি নিজের পেটের সন্তানকে এমনি করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিবি? দেখলে বুঝতে পারতি কী ব্যাপার হতে যাচ্ছিলো। এক দংগল কাক ঘিরে ধরেছিলো মেয়েটাকে। মুখ থেকে তার রুটির টুকরো নিয়ে যাচ্ছিলো ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে। নিচের তলার খুকু এক টুকরো রুটি

দিয়েছিলো তার খাবার থেকে, সেই রুটি। চোখের ঢেলা দুটো যদি নিয়ে যেতো ঠোকর মেরে, কেমন হতো তা'হলে? নচ্ছার মা কোথাকার! আর দরকার নেই তোর মা বলে পরিচয় দেবার। আজ থেকে মল্লি আমার পুষ্যি মেয়ে।

বেশ তো, নাও না মল্লিকে পুষ্যি করে। আমার কি আপত্তি।

যা যা আর বকাসনি। তোর আপত্তি কে-ইবা শোনে?—এই বলে এক ধমক দিয়ে পটলিকে দূরে ঠেলে দেয় এক পাশে বুধুর মা। তারপর মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে সে কি চিৎকার! চিৎকার করতে করতে মল্লিকে নিয়েই দোতলায় চলে যায় সে।

ও মা, ছেলের চেয়ে মেয়ে ঢের ভালো। বাপ-মায়ের দুঃখ বোঝে মেয়েরা। এই দেখুন আমিও তাই মল্লিকে পুষ্যি নিয়েছি।

আপনার ঐ মেয়ে, আর আমার এই মেয়ে। বাঃ কী মজা! যাই দেখিয়ে নিয়ে আসি গিয়ে সবাইকে।—এই বলে বুধুর মা নাচতে নাচতে আবার নিচে নেমে আসে মল্লিকে নিয়ে। ছুটতে ছুটতে 'কানা রাজার বস্তি'তে চলে যায়। গলা ফাটিয়ে হাঁকতে থাকে:

না খেয়ে না খেয়ে হাত-পা ফুলে ভোলার বাপটা মরে গিয়েছে। মরে বেঁচেছে। পাষণ্ড ছেলের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। ছেলে না নরক! নরক থেকে উদ্ধার পেয়েছে। ঐ মরাটাকে দেখে কী আর হবে। এই আধমরা মেয়েটাকে বাঁচাবার ভার নিয়েছি আমি। যে বাঁচবে তাকে দেখবে এসো। মল্লি আমার পুষ্যি মেয়ে। ছেলের চেয়ে মেয়ে অনেক ভালো।—

'কানা রাজার বস্তি'তে হাসির রোল পড়ে যায় বুধুর মা'র এসব কথা শুনে। নিজে খেতে পায় না তার আবার পুষ্যি নেবার সখ! লোকে হাসবে না তো কি।

আর এক দিকে ভোলার মা, বোন, ছেলে-মেয়েদের সে কী কান্নার ধুম!

নবীনের চোখে অবাক বিস্ময়!

বাঃ, বেশ হয়েছে তো! এমনি টানা টানা চোখের ভুরু, তলোয়ারের মতো নাক আর হাসি-হাসি মুখ না হলে সে আবার ঠাকুর দেবতার ছবি!

ভালো-মন্দ কিছুই বুঝি নে, নবীন কাকা। তোমার শিক্ষার ফলও তোমার-ই। আমি উপলক্ষ শুধু।

সে আবার কি রে বোকা ছেলে? তুই উপলক্ষ আর আমিই সব। এমন অদ্ভুত কথা কে শেখালো তোকে?

কে আবার শেখাবে? তোমার পায়ের কাছে বসে তোমার হাতের কাজ দেখার সুযোগ যদি না পেতাম ছোটবেলা থেকে, তা' হলে কি আর পটের ছবি আঁকার সখ আমার মিটতো কখনো এ জীবনে?

পলাশের কথায় বুকের পাঁজরাগুলো যেন সব এক সঙ্গে কেঁপে ওঠে নবীন চিত্রকরের। সেই সুযোগ দিয়েই তো সে অপরাধী।

বামুনের ছেলে পলাশ। মুখুজ্যের সন্তান। জমিদারী নিঃশেষ হলেও জমিদারের বংশধর তো বটে। সে পড়ে থাকবে পটুয়াদের বাড়িতে আর মুখুজ্যেরা তা মুখ বুজে সহ্য করবেন, তা হ'তেই পারে না কখনো! ভস্মস্তূপের তলায়ও সময় সময় ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলে। তেমনি মুখুজ্যেরাও এক সময় যেন জ্বলে-জ্বলে ওঠেন।

পলাশের বেলাতেও তাই হয়েছে। চোখ রাঙিয়ে তাকে শায়েস্তা করার চেষ্টা হয়েছে প্রথম প্রথম, কিন্তু কোনোই ফল হয় নি তাতে। পালিয়ে-পালিয়ে ফাঁকে ফাঁকেই সে চলে গেছে পটুয়া-

বাড়িতে। এক এক বার এসে কাটিয়ে দিয়েছে এক একটা গোটা দিন সেখানে। অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে উঠেছে তার জন্যে।

কিন্তু নবীন কী করতে পারে? সে আর তার স্ত্রী নবদুর্গা কী কম বুঝিয়েছে পলাশকে তাদের বাড়িতে না আসতে? তবু সে আসে। সে জন্যে শুধু পলাশের ওপরই যে পীড়ন চলে তা নয়, নবীনের গাঁ-ছাড়া হবার কারণও তাই।

ভাগীরথী নদী ঘুরতে ঘুরতে শান্তিপুর কালনা নবদ্বীপ হয়ে কাটোয়ার দিকে চলে গিয়েছে। এই নদীপথে ভারত ও বহির্ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ঘটেছে প্রথমে সপ্তগ্রাম এবং পরে রাজধানী-বন্দর কোলকাতার সঙ্গে। ফলে ক্রমেই উন্নত হয়ে উঠেছে এই নদীর দু' পাশের গ্রামগুলো। পাঁচ দেশের মানুষের যাতায়াতে গ্রামবাসীদের মুখেও হাসি লেগে রয়েছে সমৃদ্ধির স্বাদ পেয়ে।

নবাবের ফৌজদার সুবেদারদের ঘাঁটি বসেছে ভাগীরথীর তীরে তীরে। অনেক রাজা-মহারাজা ও জমিদারের আবাসও ছিলো এই নদী-তীরের পল্লী পরিবেশে। নানা আচার-অনুষ্ঠানে আনন্দ-উল্লাসে গ্রামগুলো ছিলো জমজমাট। নানা উপায়ে মানুষের মুখে অন্নদানের ব্যবস্থা হতো সেকালে। কাব্য-সাহিত্য ও শিল্প-সংগীতের সাধনা জীবনের অগ্রগতির পরিচয় বহন করে চলতো।

এমনি একটি গাঁয়ের বাসিন্দে নবীন পটুয়া।

গাঁয়ের নাম কালোদীঘি। কালনা শহরের পাশের গ্রাম। শুধু কালোদীঘিই নয়, অনেক গ্রামেই সেকালে পটোরা বাস করতো দল বেঁধে।

নবাবী আমলে পটোদের আদর ছিলো সমাজে প্রচুর। ক্রমশই সে আদর কমে আসে ইংরেজ আমলে। ওদের কপালে আগুন লাগে যেদিন ইংরেজ টমাস রো জাহাংগীরকে মুগ্ধ করে বিলিতি

ছবি দেখিয়ে, অর্ধবিবসনা শ্বেতাংগিনীর প্রতিকৃতি ভারত সম্রাটের সামনে তুলে ধরে।

সে ইতিহাস জানে নবীন পটুয়া। তার বাপ বনবিহারীর কাছে নেহাৎ ছোটবেলায়ই সে কাহিনী শুনেছে সে। সঙ্গে সঙ্গে রেখে বাপ তখন হাতে-কলমে কাজ শেখাতো তাকে।

ছেলেকে নিয়ে পটের কাজ করতে করতেই দুঃখ করে একদিন বলেছিলো বনবিহারী, বাদশার মনই যখন বিগড়ে গেলো বিলিতি চিত্তির দেখে, তখন আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বনবিহারীর সেদিনের সেই কথায় শুধু আফশোষ নয়, জমাটবাঁধা গভীর নৈরাশ্য যেন টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছিলো তার কণ্ঠস্বর থেকে।

দশ বছর বয়সে শোনা বুড়ো বাপের সেই আশংকা মিথ্যে হয়নি। মিথ্যে হলেই খুশি হতো নবীন। কিন্তু প্রাক্ সত্তরে দাঁড়িয়ে নিজেই চোখে কী আজ দেখতে পাচ্ছে সে?

কোথায় গেলো সে শিল্পিসমাজ? সেই চিত্রকরেরা?

পটুয়াদের পদবীই হলো চিত্রকর। প্রতিমা চিত্তির করে, ছবি এঁকে, পুতুল গড়ে সৃষ্টির আনন্দে মেতে থাকাই এদের স্বভাব। ধন-দৌলতের দিকে দৃষ্টি এদের কোনো কালেই নেই।

নবীনও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে তার গুণী বাপের নির্দেশিত পথে শিল্প-সাধনায় জীবনের তিন কাল কাটিয়ে দিয়ে এসে শেষ কালটায় যে তাকে এমনি বিব্রত হতে হবে, তা' এক দিনের জন্যেও ভাবে নি নবীন।

কালোদীঘির পটোপাড়া অবশ্য অনেক দিন আগে থেকেই লক্ষ্মীছাড়া। জাত-ব্যবসায়ে জীবনধারণ ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এক এক করে পটোপাড়ার ছেলেরা তাই কেউ লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরিতে, কেউ বা লাভজনক অন্য কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যে ঢুকে পড়ে বাঁচার পথ বেছে নিয়েছে। তারা

সব গ্রামের পাটও চুকিয়ে দিয়েছে ক্রমে ক্রমে। দেবে না তো কি? চিরকাল ধরে সমাজের অপমান, গঞ্জনা ও ঘৃণা সহ্য করবে তারা? কেন, কী অপরাধ তাদের? দুঃখে অভিমানে তাদের অনেকেই তো মুসলমান হয়ে গেছে অনেক আগেই। নবীন অবশ্য হয় নি।

তার বাপ বলতো, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ'—তাই হয় নি। মুখ বুজে এতো কাল অপমান সয়েছে। কিন্তু আর সে পারে না।

পটোরা অস্পৃশ্য বামুন-কায়েত-বৈদ্যদের কাছে। তাদের আঁকা ছবি বর্ণ-হিন্দুদের ঘরের শোভা বৃদ্ধি করে, তাদের আঁকা নানা দেবদেবীর চিত্র নিত্য পুজো পায়, প্রণাম পায় বর্ণ-হিন্দুদের, কিন্তু তাদের ছুঁলেই জাত যায়। গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে শুদ্ধ হয়ে তবে জাতরক্ষা করে তারা।

মনুষ্যত্বের এমনি অবমাননা চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে, কিন্তু তা কি চলতে পারে চিরকাল? পারে না।

কালোদীঘির ছন্নছাড়া পটোপাড়া তারই বিজ্ঞাপন। পটোপাড়ার বাস্তুভিটে থেকে সব শেষে বিদায় নিয়ে এসে সে বিজ্ঞাপনকে সম্পূর্ণ রূপ দিয়েছে নবীন।

•

কোলকাতায় অতিকষ্টে দিন কাটে নবীনের।

বেলেঘাটায় একখানা ভাড়া-ঘর। ভাড়া এগারো টাকা। নবীন, নবদুর্গা আর মনোরমা—কর্তা আর মা-মেয়ে। একখানা ঘরেই চলে যায় কোনো রকমে। কিন্তু পলাশও তো আবার আছে, তাদের সঙ্গেই সে থাকে। তবুও চলে যায়। বরং সে থাকে বলেই অনেকটা সুবিধে। সংসারের সব কিছুই তো পলাশই দেখা-শুনো করে। সে চালায়, তাই চলে।

ঘরের দাওয়ায় রাত কাটায় পলাশ। নবীনেরা তিন জন ঘরে থাকে। গ্রীষ্মের রাতে ভালোই লাগে বাইরে। হাওয়া লাগে। কিন্তু একটা গোটা শীতও কাটিয়ে দেয় সে এই ভাবে। কিছুই

ভ্রূক্ষেপ করে না। সৃষ্টির আনন্দে মাতোয়ারা সে। এই বারান্দায় বসে বসেই কালী-দুর্গা-শিব-রাধাকৃষ্ণের কতো ছবি সে এঁকে ফেলেছে এরই মধ্যে। মাটির দেয়ালে পেরেক পুঁতে পুঁতে টাঙিয়ে রেখেছে সব ছবি। দেয়াল ভরে গিয়েছে ছবিতে। পুতুলও গড়েছে অনেক।

তবে পুতুল গড়ায় হাত বেশি ভালো মনোরমার। অন্তত নবীন তাই বলে। পলাশেরও অবশ্য সেই একই কথা।

পলাশ এক এক দিন এক এক বাজারে নিয়ে যায় তার ছবি। দু-চারখানা করে নিয়ে যায়। কোনো কোনো দিন দু-একখানা বিক্রি হয়। কোনো দিন বা হয়ও না। আবার কখনো কখনো সবই বিকিয়ে যায়।

সখ করে কখনো কখনো দু-একটা পুতুলও পলাশ নিয়ে যায় সঙ্গে করে। পুতুল কিন্তু আজ অবধি কোনো দিনই ফিরিয়ে আনতে হয় নি তাকে বাজার থেকে।

পলাশের উৎসাহ বেড়ে চলে। বাজারে সে আরো বেশি করে নিয়ে যায় ছবি, আরো বেশি পুতুল। কিছুই আর পড়ে থাকে না। সংসারে সচ্ছলতা আসে।

পটচিত্রের চাহিদার খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে পলাশ। পুতুলের বিক্রি দেখে মনোরমাও।

চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। শুধু দু'জনের চেষ্টায় আর মেটানো সম্ভব নয় সে দাবী। অন্তত আর এক জনের সাহায্য পেলেও হতো। পুরো না হোক পনেরো আনা চাহিদা পূরণ করা যেতো। পলাশ তাই মনে করে।

নবীনের মন নেই আর পটের কাজে। যাদের মন খুশি করার জন্যে তার চৌদ্দ পুরুষ একাজ করে আসছে সেই গাঁয়ের লোকেরাই তার মন ভেঙে দিয়েছে। ভাঙা মন কি আর জোড়া লাগে? ভাঙা কাচেরই মতো ভাঙা মন।

তবু চেষ্টা করেছে পলাশ। মনোরমা সাহস পায় নি তার বাবাকে কিছু বলতে। কিন্তু পলাশ বার বার অনুরোধ করেছে তার নবীন কাকাকে। অনুরোধ করেছে আব্দারের সুরে একটি বার তুলি ধরতে।

কোনোই ফল হয় নি তাতে। বার বারই উত্তর দিয়েছে নবীন, সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়, জিগ্যেস করেছে পলাশ।

জবাব এসেছে, কোনো আকর্ষণ নেই।

নবীনের এ জবাবে চমকে উঠেছে পলাশ। হ্যাঁ, শিল্প-সাধনার আকর্ষণ একটা বড়ো কথাই বটে।

আকর্ষণ আছে বলেই পলাশও একের পর এক ছবি এঁকে যেতে পারছে। পলাশের আকর্ষণ সৃষ্টির আনন্দ, মনোরমা, আর বাজারের চাহিদা। তাইতো কোনো ক্লান্তিবোধ নেই তার, নেই কোনো বিরক্তি। এই আকর্ষণের জোরেই পলাশ ছিন্ন করতে পেরেছে তার পারিবারিক বন্ধন, ফিরিয়ে দিতে পেরেছে বাপ-ভাই-এর মতো আত্মজনকে।

মনে মনে এই ভাবে আত্মবিশ্লেষণ করে পলাশ। বিচার করে দেখে, বিন্দুমাত্রও ভুল নেই তার নবীন কাকার কথায়।

তবু সে আর এক বার অনুরোধ করে।

কিন্তু নবীন কাকা, তুমি যে তুলি ধরেই আত্মহারা হয়ে যেতে তা তো আমিই নিজের চোখে দেখেছি বছরের পর বছর ধরে। কাজে হাত দিলেই আবার সে আনন্দের আকর্ষণ তুমি অনুভব করবে নবীন কাকা, তুমি আরম্ভ কর। দেখবে, তোমার কাজের মহিমায় পটুয়ারা আবার বাঁচার পথ খুঁজে পাবে।

আর তা হয় না রে পাগলা ছেলে, আর তা হয় না। যারা আমায় ঘরছাড়া করলে সেই দেশের লোকেদের জন্যে হাতে আর তুলি ওঠে কখনো?—বলেই কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মোছে নবীন। চোখ তার জলে ভরে আসে। রাঙা হয়ে ওঠে নাক-মুখ।

থাক নবীন কাকা, থাক। ছবি আঁকতে হবে না তোমায়, তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো।—পলাশও মুষড়ে পড়ে বুড়োর দুঃখ দেখে।

রাগ করলি পলাশ? না বুঝেই রাগ করছিস?

না, রাগ কেন করবো?—মাটির দিকে চেয়ে পলাশ হাত কচলায়।

শোন।—নবীন তার পাশে তক্তপোষের ওপর ডেকে নিয়ে বসায় পলাশকে।

আমি খুব ভালোই জানি বাবা, আমিও যদি তোদের সঙ্গে ছবি আঁকতাম, পুতুল গড়তাম, তাহলে সংসারের অনেক সুরাহা হতো। তোদেরও অনেকটা খাটুনি কমতো। কিন্তু জানিস বাবা, আমি এখন আঁকতে বসলে পটের রঙ একাকার হয়ে যাবে চোখের জলে, পুতুলের মাটি গলে মিলিয়ে যাবে পৃথিবীর মাটির সঙ্গে। লাভ না হয়ে তাতে তো কেবল লোকসানই হবে তোদের।

বুঝেছি নবীন কাকা, আর বলবো না তোমায় ছবি আঁকতে।

আরো বলছি শোন।—নবীনের ধারণা, পলাশ খুবই আঘাত পেয়েছে তার জবাবে। তাই তাকে নানা কথায় বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে সে।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। যখনই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে যায় বাবা-মায়ের কথা, সঙ্গে সঙ্গে আমার সোনার গাঁয়ের ছবিও ভেসে ওঠে চোখের সামনে, সেই কালোদীঘির ছবি—সেই আমার পটোপাড়ার ছবি। সেই পটোপাড়া। শেষ পর্যন্ত একাই ছিলাম আমি সেখানে সাহসে বুক বেঁধে। আমার বাড়ির চার দিকে সব ছাড়া ভিটের ভাঙা ভিত, পুরোনো দেয়ালের ভগ্নস্তূপ। খাঁ খাঁ দুপুরে, নিরালা রাতের আঁধারে ভয়-ভয় লাগতো। কিন্তু মুখুজ্যেরা দল বেঁধে এসে এমন ভয়ই দেখালে যে দেশ ছেড়ে এলাম। না এসে উপায় ছিলো না। ভয় দেখালে, মুণ্ডু ছিনিয়ে নিবে আমার,

বে-ইজ্জতি করবে লোকজন দিয়ে। আমি নাকি ওদের ছেলেকে নষ্ট করেছি। হায় ভগবান!—বলতে বলতে দর-দর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ে নবীনের দুগাল বেয়ে।

কেন তুমি আবার এ-সব কথা তুলছ নবীন কাকা? সে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। মুখুজ্যেবাড়ির যে ছেলেকে নিয়ে এতো গোলমাল, তাকে পেরেছে ওরা সরিয়ে নিতে? সে তো স্বেচ্ছায় তোমার পায়ের তলায়ই পড়ে আছে। তুমি শিল্পী। ওদের কথা ভুলে যাও, ওদের ক্ষমা করো।—পলাশ এই বলে শান্ত করার চেষ্টা করে নবীনকে।

কিন্তু এতো সহজেই কি শান্ত করা যায় তাকে? দুঃখের আগুনে সমগ্র অতীত-স্মৃতি তার টগবগিয়ে উঠছে ফুটন্ত জলের মতো। পলাশের কথায় তবু যেন হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায় নবীনের মুখে। সে বলে—অক্ষমের ক্ষমার কী আর মূল্য আছে বাবা? শিল্পীর ছেলে বলেই শিল্পীর তুলির মতোই তুলতুলে আমার মন, পুতুলের মাটির মতোই নরম-কোমল অন্তর। সবই ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু পারিনে তো! ঘুরে-ঘুরে সেই পটো-পাড়ার কথা মনে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অবিচারের কথা। আচ্ছা, তুই-ই বল বাপ, আমি কী করে ভুলবো আমার বাপের আমলের সেই তিনখানা চালাঘরের কথা? ঝড়ে দেয়াল পড়ে গিয়ে একখানা ঘর সেই যে অকেজো হলো, টাকার অভাবে আর তা মেরামত করে উঠতে পারিনি। ঐ ঘরখানাতেই ছোটবেলা বাবার সঙ্গে বসে পটের কাজ শিখেছি। যতো ছবি আর পুতুল তৈরি করে সাজিয়ে রাখা হতো ঐ ঘরে। পরেও অনেক কাল ধরে ঐ ঘরে বসেই নিজেও কাজ করেছি। সে ঘর পড়ে গেলো, আর আমি তা তুলতে পারলুম না, সে কি কম দুঃখ বাপ! যে দিন চলে এলাম, বাড়ির উঠোনের তিন ধারের তালগাছগুলো নির্বাক ব্যথায় আমাদের বিদায় দিলে। বাড়ির চারপাশের আশ-শ্যাওড়া,

কচা-গাছ, ফণিমনসা, কালকাসিন্দে আরো কতো সব আগাছা—তারাও যেন সব মাথা নুইয়ে রইলো। সে সব কী করে ভুলবো পলাশ।

কিন্তু ভুলতে পারো না বলেই তো দুঃখও তোমাকে বেশি ভুগতে হয় নবীন কাকা। কী দরকার সে সব পুরোনো কথার সুতোয় মনকে বেঁধে রেখে কষ্ট দেবার? সেই পুরোনো যুক্তি তুলেই পলাশ আর একবার চেষ্টা করে তার নবীন কাকার উত্তেজনা কমাতে, তাকে একটু শান্ত করতে।

কিন্তু কে শোনে কার যুক্তি! বালিশে মাথা রেখে কথা বলতে বলতেই হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে নবীন।

কথার উত্তরে কোনো রকম সাড়াশব্দ না পেয়ে সন্দেহ হয় পলাশের। নবীন কাকার চোখ-মুখের দিকে ভালো করে একবার তাকাতেই সে বুঝতে পারে সমস্ত ব্যাপার।

ডাক-চিৎকার পড়ে যায় বাড়িতে। তবে অল্পেতেই বিপদ কাটে। মাথায় বেশ করে জল ও হাত-পা ধুয়ে দেবার পরেই জ্ঞান ফিরে আসে নবীনের।

আরো কিছু কাল পরের কথা।

সংসারে আরো সচ্ছলতা এসেছে নবীনের। পলাশ আর মনোরমার আয় বেড়েছে চতুর্গুণ। পাশের আর একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে পলাশ। নতুন ঘরে বসেই এখন ছবি আঁকে সে, সেখানেই শোয়।

ছবি-আঁকা আর পুতুল গড়ার কাজে নবদুর্গাও অনেক সাহায্য করে। না করলে কুলিয়ে উঠতে পারে না পলাশ আর মনোরমা।

নবীনের সংসারে নতুন করে আবার হাসি ফুটেছে। কিন্তু নবীন নিজে শয্যাগত। অর্ধাংগ সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছে তার বাতব্যাধিতে। শুয়ে শুয়েই করতে হয় তাকে নাওয়া-খাওয়া সব।

এ অবস্থায়ও কিন্তু গল্প করার বাতিক নবীনের কমে নি মোটেই। কাউকে কাছে পেলেই হলো, আর ছাড়াছাড়ি নেই। পুরোনো কালের দু-চারটে কথা শুনে যেতেই হবে। মাঝে মাঝে পলাশকে আর মনোরমাকেও নবীন কাছে ডেকে নিয়ে আসে। হাতের কাজ ফেলেও বসে বসে গল্প শুনতে হয় তাদের। না শুনে উপায়ই বা কি?

তেমনি গল্পেরই আসর বসেছে এক দিন বিকেল বেলা।

নবীন বলছে আর শ্রোতা বাড়ির সবাই—পলাশ, মনোরমা এবং নবদুর্গাও। নবদুর্গাকেও নবীনই ডেকে নিয়েছে।

আচ্ছা বৌ, মনে আছে তোমার, আমাদের বিয়ের বছর দুই পরে বর্ধমানের মহারাজা ডেকে পাঠিয়েছিলেন বাবাকে, তাঁর গোলাপবাগের বাড়ি ভালো ভালো ছবি দিয়ে সাজিয়ে দেবার জন্যে?—নবদুর্গার স্মৃতিশক্তি পরখ করতে চায় নবীন। নবদুর্গাকে সে ডাকে বৌ বলে।

হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ে। বাড়িতে কদিন ধরেই খুব সোরগোল চলছিলো সেই ছবি আঁকার ব্যাপার নিয়ে। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো তাই শুধু মনে পড়ে।—স্মৃতির অতলে মনের দৃষ্টি মেলে দেয় নবদুর্গা। কিন্তু খুব বেশি কিছু ধরা পড়ে না তার স্মরণের ছায়াছবিতে।

শোনো তাহলে, তখনকার দিনে পটুয়াদের কেমন সমাদর ছিলো, আমার বাবার এই একটা কাজের কথা থেকেই তোমরা তা বুঝতে পারবে।—বনবিহারী পটুয়ার কীর্তিকথা বর্ণনার ভূমিকা করলে নবীন এই ভাবে।

তখন বছর তেরো কি চৌদ্দ বয়েস আমার। মহারাজার লোক এলো বর্ধমান থেকে। জমিদারের তলব পেয়ে তটস্থ হয়ে উঠলেন বাবা। কালনার অনেক অঞ্চলই বর্ধমানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। কালোদীঘিও। বাবা ভয়ে ভয়ে গিয়ে কারণ শুধালেন মহারাজার

লোককে। কারণ শুনে নিশ্চিন্ত হলেন এবং পেয়াদার সঙ্গেই চলে গেলেন বর্ধমানে। তাঁর ধারণা, পূজো সামনে, তাই এবার বোধ হয় তাঁর ডাক পড়েছে পটের ছবি আঁকার জন্যে। বর্ধমানের রাজবাড়িতে মাটির প্রতিমা পূজোর রীতি নেই—পটপূজোর প্রথাই চলতি রাজ-পরিবারে।

পরদিনই ফিরে এলেন বাবা। ফিরে এলেন হাসতে হাসতে। পটোপাড়ার লোকরা সব জনে জনে জানতে এলো খবর। অনেকে বললে, এবার আর বনবিহারীকে পায় কে, তার কপাল ফিরলো।

অবস্থা সত্যি আমাদের সেবার থেকেই ফিরেছিলো। একখানার জায়গায় তিনখানা চালাঘর উঠেছিলো এ কাজের লাভের টাকায়। বাড়িঘরের চেহারাই পাল্টে গিয়েছিলো।

খুবই বড়ো অর্ডার পেয়েছিলেন বুঝি তোমার বাবা? তাই অনেক টাকাও পেয়েছিলেন, না?—পলাশ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নতে।

সে কথাই তো বলছি। বাবা বাড়ি ফিরেই কাজে লেগে গেলেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরাও যার যেটুকু করণীয় তাই করে যেতে লাগলো।

বড়ো বড়ো বাকারীর ফ্রেমে কাপড় এঁটে নিয়ে তার ওপর দেওয়া হতে লাগলো এঁটেল কাদার প্রলেপ। তার পর তাতে পড়লো সাদা খড়ি। জমি তৈরি করা হলো দু-দুবার খড়ির পোঁচ দিয়ে। তখন সরু কাঠ-কয়লা দিয়ে বাবা সেগুলোর ওপর এক এক করে এঁকে নিলেন সব গড়ন। তার মানে ড্রইং।

সেই সব ড্রইং-এর ওপর মোটা সরু সব তুলিতে 'কাঁই' দিয়ে তৈরি নানা রকম রঙ-এর টান যখন পড়তে লাগলো, তখন এক একটি দেব-দেবীর মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকলো। সোনালী রঙ দিয়ে হলো দেবীর মাথার মুকুট আর সাদার 'টোপ' দিয়ে দিয়ে গলার মালা, হাতের বাজু, চন্দ্রহার, পায়ের নূপুর এমনি আরো

কতো কি! নিপুণ হাতে তুলির টানে টানে এমন এক-একখানা ছবি দাঁড়িয়ে গেলো যে, এক বার তার দিকে তাকালে আর চোখ ফেরানো যায় না তা থেকে।

দেখতে দেখতে একশোখানা ছবি এঁকে ফেললেন বাবা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করলেন। এবং মহারাজার নির্দেশ মতো নিজ হাতে যেয়ে সাজিয়ে দিয়ে এলেন গোলাপবাগের নাচ-ঘর। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোর ঝকমকিতে যেন হাসতে শুরু করলে নাচ-ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে সাজানো সব পটচিত্রগুলো।

যেমনি চেয়েছিলেন তেমনি ছবি পেয়ে খুশির আর অন্ত নেই মহারাজার। তাই কাজের জন্যে শুধু ভালো দামই নয়, মুঠো ভরে বখশিসও বাবা নিয়ে এসেছিলেন সে বার বর্ধমান থেকে।

এমনি ছিলো তখনকার দিন, বুঝলে পলাশ? মেয়েরাও ঘরকন্নার কাজ সেরে ছবির কাজে লেগে যেতো। তারা কেউ করতো কাঁইবিচির আঠা, কেউ বা করতো 'তিকনি'। বড়ো বড়ো মালসায় করে সাদা খড়ি ভালো করে গুলে দেবার কাজও ছিলো তাদের। ছাগলের লোম দিয়ে সরু-মোটা-মাঝারি নানা রকমের তুলিও নিপুণ হাতে তৈরি করতো মেয়েরাই। ছবি বেশির ভাগই আঁকতো ছেলেরা, মূল পটুয়ার সঙ্গে সাকরেদি করতো সব ছেলের দল। এমনি ভাবেই মেয়ে-পুরুষের সমবেত চেষ্টায় স্বাচ্ছন্দ্যের হাসি ফুটে থাকতো সব সময় পটোপাড়ার সব ঘরে-ঘরে। হায়, কোথায় গেলো সে দিন!—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নবীন।

আমরাও তো মেয়ে-পুরুষ সকলে মিলেই কাজ করছি নবীন কাকা! তবু তুমি এতো দুঃখু করছো কেন?—পলাশ আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে বৃদ্ধকে।

নতুন কোনো ছবি আঁকা শেষ করেই পলাশ নিয়ে আসে তার নবীন কাকাকে দেখাতে। তাকে না দেখিয়ে এবং তার সার্টিফিকেট না পাওয়া অবধি পলাশের তৃপ্তি নেই, তার শান্তি নেই।

নবীনেরও খুব আনন্দ পলাশের নতুন নতুন ছবি দেখে। অবিকল তার নিজের হাতের টান বলেই ভুল হয়ে যায় এক-এক দিন। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সে এক-একখানা ছবির দিকে।

তার পরে হয়তো বলে, হ্যাঁরে পলাশ, আজ আমারই কোনো একটা পুরোনো ছবিকে রঙ করে এনেছিস বুঝি? এ করে আর কদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবি তোর নবীন কাকাকে, বল? অনেক আগেই যার মৃত্যু হয়েছে তাকে আর এমনি ভাবে মিছেমিছি বাঁচানোর চেষ্টা করিস না বোকা ছেলে! পটুয়া সমাজের সঙ্গে সঙ্গে আমারও অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেছে। আমি আর নেই।

এই বলতে বলতেই দু চোখ জল-ছল-ছল হয়ে ওঠে নবীনের।

কেন নবীন কাকা, তুমি এ সব কথা তুলছো? শিল্পীর তো মৃত্যু নেই? শিষ্যপরম্পরায় অক্ষয় জীবন তার। আমার ছবিতে নিজের তুলির টান খুঁজে পেয়েছো তুমি নবীন কাকা! আমার মধ্যেই তুমি বেঁচে থাকবে, বেঁচে থাকবে তোমার মনোরমার মধ্যে, অনাগত শিল্পীদের ছবিতে ছবিতে। পটুয়া সমাজতো লোপ পায় নি তোমার? বরং নতুন দিনের সংকেত এসেছে তাদের কাছে ইংরেজ রাজত্বের নাভিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। পটচিত্রের সমাদর আবার বাড়ছে বলেই তো বাজারে এতো বিক্রি পাচ্ছি আমার ছবির, মনোরমার পুতুলের।

বেশ কথা বাবা, বেশ কথা! মনোরমার কথা বলছিলে, এখন ওই মেয়েটাই তো আমার ভাবনা।—বলতে বলতে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে নবীন। ক্লান্তি-জড়ানো ঘুম দুচোখে নেমে এসে নীরব করে দেয় তাকে।

একা নবীনকে ঘুমুতে দিয়ে ঘর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে যায় পলাশ।

আরো দিন যায়।

বাতব্যাধিতে আরো কাবু হয়ে পড়ে নবীন। এখন আর অর্ধাংগ নয়, সর্বাংগই অবশ। কবরেজ বলেছেন, কঠিন মানসিক আঘাতের তীব্রতম প্রতিক্রিয়া এ রোগ। মুখ বেঁকে গিয়েছে, জিভ আড়ষ্ট। জড়ানো কথা সাধ্য নেই কেউ বোঝে।

নবীন আর তাই চেষ্টাও করে না কথা বলতে। লোকজন দেখলেই অক্ষমতার অসহায়তার কান্নায় তুই গণ্ড ভেসে যায় তার। কেউ তাই আর বিনা প্রয়োজনে তার কাছেও যেতে চায় না সহজে। কাছে গেলেই যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শুধু কাঁদে নবীন। সে দৃশ্য তুঃসহ।

তবু পলাশ যায়। তার আঁকা নতুন নতুন ছবি নিয়ে যায়। রোজকার বিক্রির কথা জানায় নবীনকে। খবরের কাগজে পট-চিত্রের জনপ্রিয়তার কথা নিয়ে আলোচনার সংবাদও জানায় তাকে। নবীন খুশি হয় জেনে। হাত তুলতে পারে না, কথাও বন্ধ, তবুও পলাশকে আশীর্বাদ করে মনে মনে।

নবীনের শেষ কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না পলাশ। জড়ানো জিহ্বায় অনেক তুঃখেই নবীন সেদিন বলেছিলো সেই কথা। বলেছিলো, অস্পৃশ্য বলে কাউকে ঘৃণা করা শুধু তাকে বা কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে অপমান করা নয়, সমগ্র মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করা। তার চেয়ে অস্পৃশ্য মানুষের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই ভালো পৃথিবীর মাটি থেকে।

এই কয়টি কথা বলতে বলতে উত্তেজনায় অভিমানে অস্থির হয়ে পড়েছিলো নবীন। তার সেই ধারণাকে পাল্টে দিয়ে তার মনোবেদনা তার নিদারুণ রোগযন্ত্রণার কারণকে দূর করতে চায় পলাশ। তারই জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে সে। শিরায় শিরায় ব্রাহ্মণের রক্ত বয়ে গেলেও অস্পৃশ্য পটুয়ার জীবনকেই সে বেছে নিয়েছে। শিল্পীর জীবন সুন্দরের সাধনায় নিবেদিত নিষ্কলুষ জীবন। অনন্ত সে জীবন। সে জীবনই আদর্শ পলাশের। নবীন তার প্রতীক।

নতুন ছবি এঁকেছে পলাশ। বিনোদিনী শ্রীরাধার অপূর্ব একখানি ছবি।

পাঁচ জনের বাহবা না পেলে, বিশেষ করে মনোরমা আর নবীন কাকা সার্টিফিকেট না দিলে কোনো ছবিই তার উৎরেছে বলে মনে করে না পলাশ। অথচ নিজেই এবার মনে মনে সে তারিফ করে নিজের কাজের। খুবই মনোমতো হয়েছে তার এবারের শ্রীরাধার ছবিখানি।

অন্তরে পুলকের অন্ত নেই পলাশের। মুখের হাসিখুশি ভাবে অন্তরের সেই আনন্দের আভাস। হাসতে হাসতেই সে ছবিখানা হাতে নিয়ে নিঃসংকোচে ঢুকে পড়ে নবীনের ঘরে।

নিজের হাত দুখানা অকর্মণ্য নবীনের। হাত তোলবার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। পলাশকেই তাই ছবিখানা তুলে ধরতে হয় তার চোখের সামনে।

ছবির দিকে নবীন নিষ্পলক চেয়ে থাকে। খানিক পরে চোখ ফেরায় পলাশের দিকে।

সে দৃষ্টিতে গভীর জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসা চেপে রাখতে পারে না নবীন। অথচ কথা বলার ক্ষমতা নেই। তবু বলে, তীব্র আনন্দের উত্তেজনায় চিৎকার করে বলে ওঠে—রা-ধা-না-ম-নো-র-মা!

চিৎকার শুনে ছুটে আসে নবদুর্গা। তাকে দেখে নবীন আবার বলার চেষ্টা করে—রা-ধা-না-ম-নো-র-মা। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায় যেন তার চোখে-মুখে। নবদুর্গা পলাশের হাত থেকে ছবিখানা টেনে নিয়ে ছবির ওপর একবার চোখ বুলিয়েই সব বুঝতে পারে। সে যে আরো অনেক বেশি খবর রাখে।

কর্তার আনন্দ দেখে তাকে আরো খুশি করতে চায় নবদুর্গা। মুহূর্তের মধ্যে সে পলাশের ঘর থেকে তুলে নিয়ে আসে বংশীধারী

শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্তি। মনোরমার হাতে গড়া অপূর্ব সে পুতুল। অপূর্ব হবে না, মনোরমা তার প্রাণের সমস্ত রস নিংড়ে নিয়ে গড়ে তুলেছে সারি সারি কৃষ্ণমূর্তি।

নবীনের দৃষ্টিতে এবার আরো তীব্রতর উত্তেজনা। সে আরো জোরে চিৎকার করে ওঠে—শ্রী-কৃ-ষ-ণ-না-প-লা-শ।

এই বলেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে নবীন। হাসি মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। চোখও বুজে যায়।

মনোরমা তখন তার বুকে চেপে ধরে আছে তারই হাতে-গড়া শ্রীকৃষ্ণের একখানা মূর্তি। পলাশও বুকে তুলে নিয়েছে তার বিনোদিনী শ্রীরাধাকে।

ওদের মধ্যে কেউ তখনো বুঝতেই পারেনি যে, নবীন চিত্রকর চিরবিদায় নিয়েছে এ জগৎ থেকে।

সাপ, সাপ, সাঁপ!

ঘুমের ঘোরে সাপ সাপ বলে লাফিয়ে উঠে খাট থেকে পড়েই যায় মেয়েটা। ছয় সাত বছরের মেয়ে। পড়ে গিয়ে সারা শরীর তার নীলবর্ণ হয়ে যায় একেবারে। বাড়িময় হৈ-হল্লা শুরু হয়ে যায়। মেয়েটা বুঝি আর বাঁচে না! অচৈতন্য, অসাড় তার দেহ।

ডাক্তার, বদ্যি, ওঝা, হেকিমের ভিড় জমে যায় দত্ত সাহেবের বাড়িতে। তাঁরা যে যার বিদ্যে খাটাতেও শুরু করেন সঙ্গে সঙ্গে। সুখের কথা 'খোকন'এর জ্ঞান ফিরে আসে অল্প সময়ের মধ্যেই। আর চিকিৎসকরাও যে যার কৃতিত্ব দাবী করতে শুরু করেন।

বেশ তো, তাতে আর আপত্তি করার কি আছে?—'খোকন'এর বাবা দত্ত সাহেব সকলের কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েই সকলকে বিদায় দেন যোগ্য বিদায়ী দিয়ে খুশি করে।

ছোটবেলায় কবে যে ঘুমুতে ঘুমুতে দিনের বেলাতেই সে স্বপ্ন দেখে মূর্ছা গিয়েছিলো, সে কথা তার মনেও পড়ে না। তবে সেই থেকেই যে তার নাম হয়েছে স্বপ্না তা আর তার অজানা নয়। আগের দিন বর্ষার জলে একটা সাপকে ব্যাঙ গিলতে দেখে সে নাকি খুব ভয় পেয়েছিলো এবং তার পরদিনই ঘটে এই ঘটনা, একথা অনেক পরে সে তার মায়ের মুখে শুনেছিলো।

এলাহাবাদ শহরের পুরোনো ব্যারিস্টার বঙ্কিম দত্ত। দীর্ঘকাল নিঃসন্তান থেকে সন্তান লাভের আশা তিনি ছেড়েই দিয়েছিলেন একরকম। দত্ত সাহেবের মা কমলকামিনী মৃত্যুর পূর্বদিন অবধি

নাগ বাসুকির কাছে কতো মানত করেছেন, মাথা কুটে গেছেন তাঁর পুত্রের ঘরে একটি পুত্রসন্তান দেখে যাবার জন্যে। সুচরিতার তো দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর শাশুড়ীর মানতের এবং প্রার্থনার গুণেই পুত্র না হলেও তাঁদের এই কন্যা লাভ ঘটেছে। হঠাৎ এই কন্যারত্ন পেয়ে দত্ত সাহেব এমনি আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে, 'খোকন' নামটাই তিনি চালু করে দিলেন সারা বাড়িতে এবং আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে। বিশেষ করে তাঁর মায়ের কামনাকেই তিনি রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন এইভাবে। কিন্তু ঐ দুর্ঘটনার পর কেমন যেন একটা খটকা লেগে যায় এমন কি দত্ত সাহেবেরও মনে। মেয়েটার মধ্যেও আকস্মিক ও অদ্ভুত রকমের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো।

ঘর ভরা 'খোকন'এর এতো খেলার সরঞ্জাম, কিন্তু তার কোনো কিছুই সে আর এখন ধরেও দেখে না, এ কেমন কথা।—কোর্টে বেরুবার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন জামার কলার ঠিক করতে করতে বললেন দত্ত সাহেব।

তুমি আর 'খোকন' 'খোকন' বলে ডেকো না ওকে। আমার যেন এ ডাকটা মোটেই আর ভালো ঠেকছে না। তার চেয়ে বরং খুকু বলেই ডাকো না! কি জানি কেন এমন হয়ে গেলো মেয়েটা। সারাদিন মাটি নিয়ে বসে বসে সে কেবল সাপ তৈরি করে আর তা নিয়ে সারাক্ষণ ধরে খেলা। কে জানে ঠাকুর দেবতার ইচ্ছেকে খুশি মনে মেনে না নেবার ফলেই হয়তো হয়ে থাকবে এরকম ; কাজেই কী দরকার মেয়েকে সাধ করে 'খোকন' বানানোর ?

দত্ত সাহেব গৃহিণীর এ কথা শুনে একটু মুচকি হাসি হাসেন বটে, কিন্তু কোনো জবাবই তাঁর মুখ ফুটে বেরোয় না। হঠাৎ একটা সিগারেট বার করে কেস-এর ওপর ঠুকতে ঠুকতে কি যেন তিনি ভেবে নেন দু'তিন সেকেণ্ড, তারপর সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন কোনো কথা না বলেই।

নিজের মেয়ের ব্যাপার না হলে গিন্নীর এ কথা কুসংস্কার বলে হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু এক্ষেত্রে তো আর তা হবার নয়। কাজেই কোর্টে বসে সব কাজের মধ্যেই বার বার মেয়ের চিন্তাই আলোড়িত করে তুলতে থাকে দত্ত সাহেবের মনকে। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিকই করে ফেললেন যে, সেদিন থেকে খুকুর নাম হবে স্বপ্না। কারণ স্বপ্ন দেখে খাট থেকে পড়ে যাওয়া থেকেই যখন খুকুর এরকম পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তখন তার নামের সঙ্গে সে ঘটনার একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত বলেই তিনি মনে করেন।

কোর্ট থেকে বাড়িতে ফিরেই স্ত্রী সুচরিতার কাছে তাঁর প্রস্তাবটা তুললেন দত্ত সাহেব। সে প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে সানন্দেই মেনে নিলেন সুচরিতা।

তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। স্বপ্নাকে পুত্রবধূ করে নেবার যে প্রস্তাব ব্যবসায়ী বন্ধু শ্রীমন্ত ঘোষ করে রেখেছেন, লণ্ডন থেকে চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে সুধাময় ফিরে আসার পর সে প্রস্তাবই কার্যকরী হতে চলেছে। দত্ত সাহেব প্রায় প্রস্তুত। কিন্তু হঠাৎ এক অভাবনীয় অঘটন ঘটে বসে ইতিমধ্যে। সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম। কিন্তু তা তো হবার নয়। দত্ত সাহেবের বন্ধুত্বের কথা কি ভুলতে পারেন শ্রীমন্ত ঘোষ? কতোবার যে তিনি তাঁকে মামলা-মোকদ্দমার হাংগামা থেকে রক্ষা করেছেন, তার হিসেবপত্র নেই কিছু। একটি কানাকড়িও নেন নি তিনি তার জন্যে। এ অবস্থায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর শ্রীমন্ত ঘোষ যে স্বপ্নাকে পুত্রবধূ করে নিয়ে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি রাখবেন, সে আর কী এমন বেশি!

হঠাৎ হার্টফেল করলেন দত্ত সাহেব। স্বপ্না কিন্তু বলে অন্য কথা। সে বলে সাপে কামড়ে মেড়েছে তার বাবাকে। দুদিন ধরে ক্রমাগত সে শুধু কেঁদেইছে, কোনো কথাই বলেনি। শেষে

বলে কিনা সাপের কামড়ে মারা গেছেন তার বাবা। স্বপ্নার সে কি আপশোষ সেজন্যে ? এতো পূজো দিয়েও নাগ বাসুকিকে, এতো দুধ-কলা খাইয়েও বাসুকি-ভগ্নী মনসাকে খুশি করা গেলো না। বিস্ময়ে বেদনায় ভেঙে পড়ে স্বপ্না। তবু কিন্তু বাসুকি ও বিষহরির পূজো বন্ধ হয় না তার। ঘুম থেকে উঠেই নাগ বাসুকির মন্দিরে নিত্য প্রণাম করতে যাওয়া, তারপর স্নানান্তে একবার করে দুধ-কলা ভোগ দিয়ে পূজো দিতে মন্দিরে আসা এবং প্রতি সন্ধ্যায় আরতি ও প্রার্থনায় যোগ দেওয়া একদিনের জন্যেও এই বাধাধরা নিয়মে ছেদ পড়তে দেয় না স্বপ্না। এমন কি তার বাবার মৃত্যুর পরেও নয়।

নাগ বাসুকির পূজার্চনায় দিনের অনেকখানি কাটিয়ে দিলেও সংসারের আর সব কাজকর্ম কিন্তু স্বপ্না স্বাভাবিকভাবেই করে থাকে। আর সংসার বলতে এখন তো শুধু তার মা, পাচক বামুন আর ঝি-চাকর। মায়ের কাজ, তাঁর সেবা-যত্ন যেটুকু করার তা নিখুঁতভাবেই করে স্বপ্না। তবু তার মনটা যেন সব সময়েই পড়ে থাকে ঐ নাগ বাসুকির মন্দিরে। এ ব্যাপারের রহস্য যে কী তা জানবার জন্যে দত্ত সাহেব থাকতেই অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু নানা গবেষণায় নানা রকমের অনুমান করা গেলেও প্রকৃত রহস্যোদ্ধার এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

নাগ বাসুকির মন্দির পরিবেশ সত্যি ভারি আকর্ষণীয়। মন্দিরের তিনদিক ঘিরে রয়েছে গঙ্গা। মাতা গঙ্গার কোলে যেন আদরে দোল খাচ্ছেন পুত্র বাসুকি। সরকারী হিসেবে হাজার বছরেরও বেশি পুরনো এ মন্দির। ভারতে হিন্দু যুগের প্রায় অবসানকাল থেকে ইতিহাসের নানা স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর ইটে-পাথরে। তিন শ বছর আগে পেশোয়ারা নাকি নতুন রূপ দিয়েছেন এ মন্দিরের। মন্দিরপ্রাংগণ থেকে দক্ষিণে গঙ্গায় যেয়ে নেমেছে দু সারি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের সিঁড়ি। একটি ঘাটের

সুদৃশ্য সিঁড়ি ভেঙে যাওয়ায় অনেকখানি হতশ্রী হয়ে পড়ছে মণি পরিবেশ। তাহলেও এ পটভূমি নিতান্তই মনোরম। অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয় গঙ্গা-স্পর্শ পেতে হলে। সেই সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে তীর্থরাজ ত্রিবেণীর পাঁচজন নায়কের নাম প্রতিদিন প্রতিবারই স্মরণ করে স্বপ্না—

ত্রিবেণীং মাধবং সোমং
ভরদ্বাজং চ বাসুকিং
বন্দে অক্ষয় বটং শেষং
প্রয়াগং তীর্থনায়কম্।

এমনি ভাবে গঙ্গা স্পর্শে পবিত্র হয়ে তবেই স্বপ্না মন্দিরে প্রবেশ করে। এ কথা এলাহাবাদ দারাগঞ্জের কে না জানে?

নতুন কাউকে কাছে পেলেই হলো। অমনি স্বপ্না বসে যাবে তাকে নাগ বাসুকির মাহাত্ম্য শোনাতে। বলবে, ভারতে এতো তীর্থ কিন্তু তাদের কোনো রাজা নেই বলে ব্রহ্মা হঠাৎ একদিন স্থির করলেন ত্রিবেণীকে তীর্থরাজ পদে অভিষিক্ত করতে। পুত্রাদি নিয়ে ব্রহ্মা মর্ত্যের দিকে পাড়ি জমালেন এবং পাতাল থেকে ডেকে নিলেন ভোগবতী গঙ্গা আর শেষ নাগকে। শেষ নাগ আবার সদলবলে ছাড়া কোথাও যান না। কাজেই ত্রিবেণীর রাজ্যাভিষেকে তাঁর সঙ্গে এলেন বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি হাজার দশেক নাগ। অভিষেক শেষে কেউ কেউ থেকে যেতে চাইলেন এই সুন্দর পৃথিবীতে। যারা থাকলেন তাঁদের মধ্যে এই নাগ বাসুকি একজন। সেই থেকে তিনিই হলেন পৃথিবীর নাগরাজ। তাঁর আহ্বানে ত্রিলোকের সমস্ত দেবতারা এসে মিলিত হন বাসুকি মন্দিরে প্রতি শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীতে। দেবতাদের এই মেলাকে উপলক্ষ্য করেই তো লক্ষ পুণ্যার্থীর উপস্থিতিতে এখানে প্রতিবছর বসে নাগপঞ্চমীর মেলা।

বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে স্বপ্না। মস্ত একটা প্রশ্ন তুলে

সে উপসংহার টানে তার বক্তব্যের। বলে, যে নাগ বাসুকির ডাকে বছর বছর ত্রিলোকের সব দেবতারা এসে জড়ো হন ত্রিবেণীতে, তাঁকে ডাকতে পারলে আর বিপদের ভয় থাকতে পারে কোনো?

উচ্চশিক্ষিত আধুনিক বাঙালী পরিবারের এই তরুণী কন্যার এধরনের ভক্তির প্রাবল্য দেখে অনেক রকমের রটনাও রটেছে মহাতীর্থ প্রয়াগধামে। সে সব কথা স্বপ্না তো গ্রাহ্যই করে না, এমন কি সে সব কাহিনী বলে শ্রীমন্ত ঘোষের কান-ভাঙানোও সম্ভব হয়নি। ঘোষ ইতিমধ্যে সকল রকমের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্বপ্নাকে তার পুত্রবধূ করে ঘরে নিয়ে এসেছেন। পিতৃগৃহে স্বপ্না যে স্বাধীনতা ভোগ করতো, ঘোষ-পরিবারে বধূরূপে এসেও তার সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণই থাকবে, একথা শ্রীমন্ত ঘোষ আগে থেকেই বলে দিয়েছেন।

দত্তবাড়ি থেকে ঘোষবাড়ি চার পাঁচ মিনিটের পথ। ঘোষ-বাড়ি থেকে নাগ বাসুকির মন্দিরে যেতে পথেই পড়ে 'দত্ত লজ'। মন্দিরে যেতে আসতে দিনে দু-তিনবার করে মাকে দেখাশুনো করে আসার কোনো অসুবিধাই হয় না স্বপ্নার। ইদানীং মা তার আর বসতবাড়িতে থাকেন না, থাকেন পাশের ঠাকুরবাড়িতে। স্বপ্না মায়ের সঙ্গে দেখা করার পর মাঝে মাঝে তাদের তিন মহলা বাড়ি, বিশেষ করে তার বাবার শোবার ঘর আর বৈঠকখানা ঘুরে ফিরে দেখে আসতো। কিন্তু এখন আর বাড়িতে বড়ো একটা ঢোকে না। দত্ত সাহেবের নানা স্মৃতি তীরের মতো যেন এসে বেঁধে তার হৃদয়ে। অথচ এ বাড়ির মালিক এখন স্বপ্নাই। দত্ত সাহেবের উইলে সেই-ই তাঁর উত্তরাধিকারী।

এদিকে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসাকে ব্যবসায় হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী নন সুধাময়। বিপুল সম্পদের

অধিকারী তাঁর পিতা, শ্বশুরের প্রচুর সম্পত্তি এসে গেছে তাঁর হাতে সহধর্মিণী স্বপ্নার মাধ্যমে। রোগক্লিষ্ট মানুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে সুধাময় কৃতসংকল্প। এরই মধ্যে দরদী চিকিৎসক হিসেবে অত্যধিক জনপ্রিয়তা হয়েছে তাঁর সারা শহর জুড়ে। রোগের অর্ধেক উপশম হয় চিকিৎসকের দরদে, একথা যখন তখন শোনা যায় সুধাময়ের মুখে। একথাও তিনি বলেন যে, ডাক্তারীকে নিছক ব্যবসায় বা অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে মনে করা ঠিক নয়, এর একটা সেবার দিক আছে এবং সেটাই এ বৃত্তির মহত্তর দিক।

আচ্ছা স্বপ্না, পঙ্গু শিশুদের চিকিৎসার জন্যে 'দত্ত লজে' একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলে কেমন হয়? জীবনের শুরু থেকেই যারা পৃথিবীর আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত তাদের কতো কষ্ট বলতো! আনন্দের মধ্যেই মানুষের দেহ ও মন সত্যি করে বেড়ে ওঠে। পঙ্গু শিশুদের সে রকম আনন্দ পাবার সুযোগ করে দিতে পারলে খুবই ভালো একটা কাজ হয়, তাই না! তাছাড়া আমার তো মনে হয় দত্ত সাহেবের স্মৃতি-রক্ষার এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কোনো কিছুতেই হতে পারে না। তোমার মত পেলেই আমি এ কাজ আরম্ভ করে দিতে পারি।

বারে, আমার বাবার স্মৃতি-রক্ষার কাজে আমার মতামত সম্বন্ধে আবার কোনো প্রশ্ন হতে পারে নাকি? আশ্চর্য! আজ থেকেই তাহলে কাজ শুরু করে দাও না।—যে স্বামী তার নবপরিণীতা পত্নীর সঙ্গে হ্যাঁ কি না ছাড়া আর বিশেষ কোন কথা বলার সুযোগ পান না তিনি এতো বড়ো একটা কাজের কথা তুলতে পারেন তার কাছে স্বপ্না তা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। তাই সে সুধাময়ের ইচ্ছের সঙ্গে, তাঁর কাজের সঙ্গে নিজেকেও একান্তভাবে জড়িয়ে রাখতে চায়।

স্বপ্নার মা কিছুকাল ধরে ৺কাশীধামে গিয়ে বাস করছেন।

বাবা বিশ্বনাথের চরণামৃত মুখে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, এই তাঁর ইচ্ছে। তাঁর সে ইচ্ছে পূরণ করার সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন মেয়ে-জামাই।

'দত্ত লজে'র তিন মহলা বাড়িতে 'বি কে দত্ত পোলিও ক্লিনিক' স্থাপিত হয়েছে। ত্রিশটি পঙ্গু শিশুকে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে। এছাড়া আউটডোরের রোগী তো আছেই। রোগের যন্ত্রণা আছে, পঙ্গু শিশুদের অসহায়তার মনোদুঃখ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও 'বি কে দত্ত পোলিও ক্লিনিকে' যে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে রোগী শিশুরা ভালো হয়েও 'দত্ত লজ' ছেড়ে যেতে চায় না। কাঠের হাতি-ঘোড়া চড়বার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে, রয়েছে দোলনা-খেলনা আরো কতো কি। বিশেষ করে ডাঃ ঘোষের সঙ্গছাড়া হতে মন ভেঙে যায় যেন তাদের। ডাঃ ঘোষ তাদের কথা দেন যে, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি রোজ দেখা করে এবং তাদের সঙ্গে খেলা করে আসবেন, চকোলেট আর খেলনা দিয়ে আসবেন, তবেই না তারা হাসপাতাল ছেড়ে তাদের বাপ-মা-ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ি যেতে রাজী হয়!

প্রথম প্রথম স্বপ্নাও মাঝে মাঝে পোলিও ক্লিনিকে এসে রুগ্ন শিশুদের সঙ্গে হাসি-তামাসায় যোগ দিতো। তার ভালোই লাগতো তাতে। এক একটি মা এসে প্রাণঢালা ভালোবাসায় তাঁর সন্তানকে কি ভাবে সিক্ত করে দিয়ে যায় তা গভীর ক্ষুধাভরা দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেছে স্বপ্না। দেখতে দেখতে শেষে এ দৃশ্য যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে। তার বুকে যেন সুঁচের মত গিয়ে বিঁধেছে সেই মাতৃস্নেহের ধারা। তাছাড়া বার বার নাগ বাসুকির মন্দিরে যাতায়াতের পর এমন বেশি সময়ও আর থাকে না তার হাতে যে, সে নিয়মিতভাবে হাসপাতালে যেতে পারবে। স্বামীর ওপরও যে অভিমান হয়নি একটু তাও নয়। একজন তো দিনরাতের

পৌনে ষোল আনাই কাটিয়ে দিচ্ছেন হাসপাতাল নিয়ে, সেখানে আবার আর একজনের কীই বা এমন প্রয়োজন হতে পারে ?

স্বপ্না কেমন যেন শুকিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে কিছুদিন ধরে। তার কিসের যে এতো ভাবনাচিন্তা তাও বুঝে উঠতে পারে না কেউ। বৌমার শারীরিক অবনতি শ্রীমন্ত ঘোষকে চিন্তিত করে তোলে। ওর বাপ নেই, তাঁকেই তো এখন পুরো নজর রাখতে হবে স্বপ্নার ভালোমন্দের ওপর। বাপ নেই, একথা যেন কখনো মনে করতে না হয় স্বপ্নাকে। সত্যি সত্যি তেমনি সতর্ক ভাবেই চলেন শ্রীমন্ত ঘোষ। সর্বক্ষণ ডাক-খোঁজ, স্নেহ-আদরে তাকে সুখী করার চেষ্টার যে কোনো ত্রুটি নেই ঘোষবাড়িতে একথা স্বপ্না নিজেই তার মাকে জোর গলায় বার বার বলেছে।

হ্যাঁরে খোকা, বৌমাকে কিছুদিনের জন্যে কাশীধামে তার মায়ের কাছে পাঠালে হয় না ? সেখানে থেকে শরীরটা বৌমার যদি ভালো হয়। কিছুদিনের মধ্যে কেমন কালো কটা হয়ে গেলো মা আমার, আর কেনই বা যে এমন হলো তারও তো কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। তুই তো ডাক্তার, না হয় একটা ভালো রকমের চিকিচ্ছেই করে দেখ না।—সুধাময় মধ্যাহ্ন আহারে বসেছেন, এই সুযোগে শ্রীমন্ত এসে বলেন ছেলেকে এই কথা।

হ্যাঁ বাবা, তাই করবো।—এই বলে খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ে হাত-মুখ ধুয়েই টেথিসকোপটা আবার গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে পড়েন ডাঃ ঘোষ। বাড়িতে বসে গল্প করে সময় কাটালে আর যারই চলুক তাঁর চলে না। এক-আধ ঘণ্টা দেখতে না পেলে হাসপাতালের ছেলেমেয়েগুলো অধীর হয়ে ওঠে 'ডাক্তারদা কোথায়, ডাক্তারদা কোথায়' বলে। তাদের ছেড়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকার জো আছে ?

সুধাময়ের একদার সহপাঠী এবং এখনকার সহকারী ডাঃ শংকরীপ্রসাদও একদিন ডাঃ ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন

স্বপ্নার স্বাস্থ্যের দিকে। ঘোষবাড়িতে শংকরীপ্রসাদের আনাগোনা নতুন নয় কিছু, তবে স্বপ্নার আগমনের পর সে আসা-যাওয়াটা একটু বেশি বেড়েছে বৈকি! নিত্য বন্ধুপত্নীর খোঁজ-খবর ও তদারক করা এবং সেই অজুহাতে একটু-আধটু ঠাট্টা-তামাসা করা একটা অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে তাঁর। স্বপ্নার ভালো লাগে না এ বাড়াবাড়ি।

বাইরে তো কোনো রোগই ধরা পড়ছে না। তবু নানা ওষুধ-পত্তর পুষ্টিকর খাদ্য ও ভালো ভালো ফল-ফলাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে স্বপ্নার জন্যে। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুতেই যেন কিছু হবার নয়। স্বাস্থ্য তার ক্রমশই খারাপ হয়ে চলেছে। নাগ বাসুকির মন্দিরে তবু তার নিয়মিত যাওয়া চাই। অবশ্য যেতে হয় তাকে অতি কষ্টে। ফিরে এসে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে সে।

অসুস্থ স্বপ্না এখন প্রায় রাতদিনই শুয়ে শুয়েই কাটায় বটে, কিন্তু চোখে তার ঘুম আসে না কখনো। ঘুমুতে যেন ভয় লাগে তার। ইচ্ছে করে চোখ বুজলেও তার যেন মনে হয়, নাগরাজ বাসুকির ক্রোধান্বিত সহস্র ফণা তার কোনো অপরাধের শাস্তি বিধানের জন্যে যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে আর চোখ বুজে থাকতে পারে না, চোখ খুলতেই দেখে—না, কোথাও কিছু নেই তো!

রাত্রিতেও একা ঘরেই কাটায় স্বপ্না। ক্লান্ত সুধাময় ক্বচিৎ কখনো যদিও বা বাড়িতে এসে রাত কাটান, তাও রাত্রির শেষ দু-তিন ঘণ্টা। দুটো কথা বলার মতোও শরীরের অবস্থা তখন থাকে না তাঁর। অবসন্ন শরীরকে বিছানায় এলিয়ে দিয়েই ঘুম। এদিকে সারারাত ধরে স্বপ্না ঘরময় পঙ্গু শিশুদের কিলিবিলিতে হাঁফিয়ে ওঠে যেন। তাকে ঘিরে সাপের মতো কিলিবিলি করে এই শিশুর দল। স্বপ্না এক-একবার ওঠে বসে, আলো জ্বালায়। কই, কোথাও তো কিছু নেই!

হঠাৎ সেদিন দু-চার মিনিটের অবসরে স্বপ্না বলেছে সুধাময়কে এসব কথা।

ও সব কিছু নয়, তোমার নাম-মাহাত্ম্য—নিয়ম মতো ওষুধ খাও, ভালো ভালো ফল আর খাবার খাও, সেরে যাবে। এই বলে আলোচনায় দাঁড়ি টেনে দিয়েছেন সুধাময়।

অবশ্য বড়ো বড়ো ডাক্তারও ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে স্বপ্নাকে। ওষুধে ওষুধে বাড়িতে একটা পৃথক ডিসপেন্সারী তৈরি হয়ে গেছে তার জন্যে। কিন্তু কোনোটাতেই কোনো ফল না পাওয়ায় ছেলের সঙ্গে পরমর্শ করে শ্রীমন্ত ঘোষ তাঁর বৌমাকে কাশীধামে পাঠিয়ে দেওয়াই স্থির করে ফেলেছেন। দিন তারিখও ঠিক।

ডাঃ শংকরীপ্রসাদকে ঠিক করেছেন সুধাময়, তিনিই বেনারসে পৌঁছে দিয়ে আসবেন স্বপ্নাকে তার মায়ের কাছে। স্বপ্না আপত্তি জানিয়েছে ডাঃ প্রসাদের সঙ্গে যেতে, সে আপত্তির কারণ সম্বন্ধেও সে ইংগিত করেছে। সুধাময় নিজে তাকে দিয়ে আসে এই সপ্নার ইচ্ছে। কিন্তু ডাঃ ঘোষের সময় কোথায়? 'বি কে দত্ত পোলিও ক্লিনিক' ফেলে শহরের বাইরে যাবার কথা তিনি যে কল্পনাও করতে পারেন না। এতগুলো ছেলেমেয়ের কী দশা হবে তাহলে?—এই চিন্তাই সুধাময়ের মনকে পঙ্গু করে ফেলেছে। তাই নানা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন তিনি স্বপ্নার আপত্তি। স্বপ্না চুপ করে থাকে, একটি কথাও আর বলে না। স্তব্ধ মেঘের মতোই তার সে নীরবতা।

সুধাময়ের অনুরোধে প্রথম প্রথম একটু মৌখিক আপত্তি জানালেও ডাঃ শংকরীপ্রসাদ আনন্দে আটখানা হয়ে ওঠেন মনে মনে। অনুরোধ আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্ল্যান ছকে ফেলেন ডাঃ প্রসাদ। সুন্দরী স্বপ্নার পুরোপুরি একখানা ছবি ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে। শুধু একখানা ছবি নয় স্বপ্নাময় মনে হয় তাঁর সারা পৃথিবী। তাকে যে চাই-ই তাঁর।

দ্বিতীয় বারের অনুরোধে শংকরীপ্রসাদ আর আপত্তি করেন না। দিন ও সময়টা জেনে নেন যাওয়ার। পরের দিন বিকেলের ট্রেনে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে বলে দেন তাঁকে সুধাময়।

প্রায় ঘণ্টা তিনেকের পথ। অন্তত এ সময়টুকুর জন্যে শংকরীপ্রসাদ সম্পূর্ণ নিজস্ব করে পাবেন স্বপ্নাকে। কিন্তু সে পাওয়া যদি সত্যিকারের পাওয়া না হয়! কেমন একটা আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে থাকে তাঁর মন। স্বপ্না তাঁকে এড়িয়ে চলতে চায় এ তিনি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এবার? এবার আর তাঁকে এড়িয়ে চলার কোনো উপায় নেই। ট্রেনের তিন ঘণ্টা ব্যর্থ হলেই বা কী ক্ষতি? তারপরই বা স্বপ্না কোথায় যাবে এবং কী করেই বা যাবে তাঁর হাতছাড়া হয়ে? সুধাময়ের সঙ্গে কথা হবার পর সেদিন সারারাত ধরে শংকরীপ্রসাদের ভাবনা চলেছে এই ধারায়।

সেদিন অনেক রাত্রিতে বাড়ি ফিরেছেন সুধাময় হাসপাতাল থেকে। খুব ক্লান্ত, খুব অবসন্ন। স্বপ্না একবার চেয়ে দেখেছে তাঁর দিকে, তাঁর সঙ্গে একটু কথাও বলতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু এত রাত্তিরে পরিশ্রান্ত এই মানুষটির ওপর জুলুম করা হবে না কথা বলতে গেলে? স্বপ্নার মনে কেমন যেন একটু মমতা জাগে। সে পাশ ফিরে শোয়।

বারবার এতো বাবার কথা মনে পড়ছে কেন আজ? মায়ের কথাও মনে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। এমন তো আর কোনো দিন হয়নি। কেমন যেন একটা অবসাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহ জুড়ে স্বপ্নার। একি তন্দ্রা? ডাঃ শংকরীপ্রসাদের মুখে একটা বীভৎস হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায় যেন স্বপ্নার তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে।

সাপ, সাপ, সাপ!—স্বপ্নার ভয়ার্ত চিৎকারে শুধু সুধাময় নয়, বাড়িসুদ্ধু সবাই জেগে ওঠে। এঘর-ওঘর দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি পড়ে যায় সারা বাড়িতে। ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকিতে আশ-পাশের লোকজনও ছুটে আসে।

ফিটের ব্যামো তো বৌমার ছিলো না কোনো দিন। এ এক নতুন উপসর্গ। ভারি তো মুস্কিল!—বিশেষ চিন্তান্বিত ভাবে বুড়ো শ্রীমন্ত ঘোষ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলেন একথা।

কোনো চিন্তে করো না বাবা। ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে স্বপ্না। এক্ষুণি সে ভালো হয়ে উঠবে, ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি। কাঁপুনিটা বন্ধ হয়ে গেছে, চোখে-মুখে জল ছিটোতে ছিটোতেই তার জ্ঞান ফিরে আসবে।—সুধাময় এই বলে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করেন তাঁর বাবাকে। কারণ ছোটখাটো ভাবনা-চিন্তার ফলেই ইদানীং হঠাৎ হঠাৎ শ্রীমন্তরও ফিট হচ্ছে, আর এ তো একটা বড়ো দুশ্চিন্তা।

শাশুড়ী হিরণ্ময়ীর আশীর্বাদস্পর্শে ও ননদ ছন্দার সেবাযত্নে স্বপ্নার জ্ঞান ফিরে আসতে থাকে আস্তে আস্তে। মাঝে মাঝে অনুচ্চস্বরে তবু সে বলে ওঠে 'সাপ, সাপ, সাপ!'। রাত্রি ভোর হয়ে আসে। স্বপ্না নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে বেশ খানিক বেলা পর্যন্ত।

নাগ বাসুকির মন্দিরে তো এখনও প্রণাম করতে যাওয়া হয়নি!—স্বপ্না ধড়ফড় করে উঠে বসে। তাড়াতাড়ি বেশবাস ঠিক করে নিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে মন্দিরে যাবার উদ্যোগ করে সে। হিরণ্ময়ী এসে তার সামনে দাঁড়ান।

বৌমা, তোমার এই শরীর নিয়ে তুমি কি আজ পারবে যেতে মন্দিরে? যদি যেতেই হয়, তাহলে হরদেওকে অন্তত সঙ্গে নিয়ে যাও!

তাই যাচ্ছি মা।—এই বলে শাশুড়ীকে প্রণাম করে এবং শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে মন্দিরের পথে এগোয় স্বপ্না। হরদেও তার সঙ্গে সঙ্গে যায়।

সকাল থেকেই দিনটা কেমন মেঘলা মেঘলা। নাগ বাসুকির

মন্দির-প্রাংগণ থেকে গঙ্গার ওপারে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে দেখা যায়, নদীতীরের বৃক্ষরাজির ওপর আকাশের শীতলপাটি বিছিয়ে মেঘের রাণী যেন শুয়ে পড়েছেন।

তুই দাঁড়া এখানে হরদেও, আমি গঙ্গা স্পর্শ করে আসি।—এই বলে স্বপ্না নিচে নেমে যায় সিঁড়ি বেয়ে, অনেক নিচে। সব চেয়ে নিচের সিঁড়ি থেকে গঙ্গাজল স্পর্শ করতেই হঠাৎ কেমন একটা কম্পন বোধ করে স্বপ্না। শুধু স্বপ্না নয়, উপরেও সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে সবাই 'ভূমিকম্প' 'ভূমিকম্প' বলে। শাঁখ বেজে ওঠে মন্দিরে, শঙ্খধ্বনি আর সীতারামের জয়ধ্বনি ভেসে আসে শহরের চতুর্দিক থেকে। গঙ্গার তরংগ উত্তাল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। হরদেও হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো, তার সম্বিৎ ফিরে আসতেই সে উর্ধশ্বাসে ছুটে যায় গঙ্গার ঘাটে, কোথায় তার বৌদিমণি! হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে দেয় হরদেও।

এদিকে মন্দির-পুরোহিত সবাইকে এসে দেখতে বলেন এক অদ্ভুত ঘটনা। নাগ বাসুকির ফণা তখনও কাঁপছে। কোন ভক্তের বিপদে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন নাগরাজ কে জানে?

একটু পরে হরদেওর কান্না থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ে একটি দুর্ঘটনার কথা, স্বপ্নার সলিল-সমাধির কথা।

আরও পরে শ্রীমন্ত, হিরণ্ময়ী, সুধাময় ও ছন্দার অশ্রুবন্যা গিয়ে মেশে গঙ্গার পবিত্র জলের সঙ্গে আর শংকরীপ্রসাদের আপশোষ ও দীর্ঘশ্বাস বাতাসকে করে তোলে বিষাক্ত।

এ কলেজে সত্ত এসেছেন সুবিমল।

ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে প্রায় বছর তিনেক একাজ সেকাজে কাটাতে হয়েছে সুবিমলকে। কোথাও তাঁর মন বসেনি। না বসারই কথা। নিজের কলেজ-জীবন থেকেই অধ্যাপনার কাজটা তাঁর ভারি পছন্দ। কাজেই মাইনে বা আয় যতো বেশিই হোক না কেন, শেষের দিকে ফুড-ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেক্টরের পদ থেকে কবে যে তিনি মুক্তি পাবেন, তাই ছিলো তাঁর এক মাত্র চিন্তা।

হঠাৎ সে সুযোগ একদিন এসে গেলো নিতান্তই আকস্মিক ভাবে। ভবানীপুরে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ আলাপ হয়ে গেলো সূর্যকান্ত কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে। অধ্যক্ষ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সুবিমলের মামার পুরোনো বন্ধু। সুবিমলের সঙ্গে আলাপে তিনি ভারি খুশি। সেদিনই তিনি কথাটা পেড়েছিলেন এবং বন্ধুকে একটু আভাসও দিয়ে গিয়েছিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো তিনি ডেকে পাঠাবেন তাঁর ভাগ্নেকে তাঁর কলেজে চাকরি নেবার জন্যে। টাকা-পয়সার বিচারে মামার মন তাতে বিশেষ সায় না দিলেও, ভাগ্নের আগ্রহ দেখে একরকম চুপ করেই থাকতে হয়েছিলো তাঁকে সে প্রস্তাবে।

খুব শীগগিরই কিন্তু ডাক এসেছিলো প্রিন্সিপাল ব্যানার্জির তরফ থেকে এবং সুবিমলও এক কথাতেই রাজী হয়েছিলেন। প্রিন্সিপালের নিজের সিলেকশন, কাজেই কমিটির অনুমোদনও হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তা নিয়ে যে আবার মেঘ জমতে

শুরু করবে আকাশে, তা আর কি করে বুঝতে পারবেন নবনিযুক্ত অধ্যাপক!

সুবিমলের কিন্তু ইচ্ছে ছিলো কোলকাতার কোনো কলেজে পড়ানোর। কিন্তু প্রথমেই শহরের কলেজে চান্স পাওয়া যে একরূপ অসম্ভব এবং একালে যে প্রায় সবারই অধ্যাপনা শুরু হয় শহরতলী বা মফঃস্বলের কলেজগুলোতে, তা বেশ ভালো করেই জানতেন সুবিমল। তাই এ চাকরির অফার আসতে কোনো রকম ওজর-আপত্তিই ওঠেনি তাঁর দিক থেকে। তাছাড়া যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেরূপ ঘোরালো হয়ে উঠছে তাতে ফুড-ডিপার্টমেন্টের চাকরি ছেড়ে দিয়ে অনিশ্চিতভাবে অধ্যাপনার কাজ খুঁজে বেড়াতেও ভরসা পাওয়া যায় না! কাজেই 'সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা' ঠিক হবে না, তাঁর বিচারে এও বিশেষভাবেই মনে হয়েছে।

মহানগরীর প্রান্তবর্তী এই কলেজের পরিবেশ প্রথম অভিজ্ঞতায় বেশ ভালোই লেগেছে সুবিমলের।

এ কলেজের বয়েসও বড়ো কম নয়। বছর আঠারো। তবে এর মহিলা বিভাগটি নতুন। বছর চার আগের সৃষ্টি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে কোলকাতা ছেড়ে লোক পালানোর হিড়িক চলছে তখন। এ অঞ্চল সে সময়ে ক্রমে ক্রমে লোকে লোকারণ্য। নতুন বাসিন্দাদেরই বিশেষ তাগিদে সেই হট্টগোলের সময়তেই কলেজের মহিলা বিভাগের গোড়াপত্তন।

সূর্যকান্ত কলেজ-ভবনেই সৌদামিনী উইমেন্স ইণ্টার কলেজের ক্লাস বসে সকালবেলা। একই কমিটির পরিচালনাধীন হলেও সৌদামিনী কলেজের অধ্যাপনাভার সম্পূর্ণভাবেই মেয়েদের এবং কি ব্যবস্থাপনা বা কি শিক্ষাদান সকল বিষয়েই অধ্যক্ষা শ্রীমতী সুপ্রীতি মজুমদারের যোগ্যতার প্রশংসা প্রত্যেকের মুখে মুখে। কাগজে-কলমে প্রিন্সিপাল ব্যানার্জির ওপর অধিকার দেওয়া

রয়েছে প্রয়োজনমতো মিস মজুমদারকে পরামর্শাদি দেবার। কিন্তু এ কয় বছরে খুবই কম কারণ ঘটেছে সৌদামিনী কলেজ সম্পর্কে উপযাচক হয়ে প্রিন্সিপাল ব্যানার্জির কোনো উপদেশ বর্ষণের। অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষার মধ্যে মাঝে মাঝে যে আলাপ-আলোচনা না হয় তা নয়, তবে সে সব আলোচনা চলে উভয় বিভাগের সমস্বার্থ বিষয়ক নানা প্রশ্ন নিয়ে—কোনো তরফ থেকে অপর পক্ষকে উপদেশ বা পরামর্শ দেবার ব্যাপার নিয়ে নয়।

অতুলনীয় কর্মক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে পদোচিত গাম্ভীর্যের জন্যেও মিস মজুমদারের খুব সুনাম পরিচালকমণ্ডলীর কাছে এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও এজন্যে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল।

সূর্যকান্ত কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে প্রায় সবাই একটু গম্ভীর ধরনের। প্রথম থেকেই সুবিমল তা লক্ষ্য করেছেন। সবারই বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি বা তার চেয়েও বেশি বলেই হয়তো তাঁদের মধ্যে এমনি গাম্ভীর্য এসে গিয়ে থাকবে। তবে তাঁর পাল্লায় পড়ে তাঁদের সকলকেই খানিকটা পাল্টাতে হবে, এই ছিলো সুবিমলের ধারণা।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা কিন্তু হলো না। প্রথম দিনই একটা ক্লাস সেরে প্রফেসার্স লাউঞ্জে এসে সুবিমল খুব হৈ-হৈ করে গাল-গল্প, ঠাট্টা-তামাসা শুরু করে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লক্ষ্য করলেন, বয়স্ক অধ্যাপকেরা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন অনেকেই এবং কেউ কেউ বা উঠে বেরিয়েও গেছেন ঘর থেকে।

একটু বাদেই অধ্যক্ষ মহাশয় এলেন সেখানে। উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন নতুন অধ্যাপককে। অধ্যক্ষের বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ। মাঝারি গড়ন। বেশ হাসিখুশি লোক। ভালো লোক বলেই হয়তো সব সময়ই তাঁর মুখে হাসি লেগেই আছে।

কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন পদে নিছক ভালোমানুষ

বোধহয় বাঞ্ছনীয় নয়। ভাইস প্রিন্সিপাল কোলকাতার কোনো বড়ো কলেজে চলে যাওয়ায় এবং পুরোনো প্রিন্সিপালের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে সিনিয়ারিটির বিচারে অধ্যাপক ব্যানার্জিকে সে পদে উন্নীত করা হয়েছে বটে, কিন্তু গত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতায় কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারে নতুন অধ্যক্ষের তেমন কোনো কৃতিত্বের পরিচয় পায়নি কমিটি। বরং এমন অভিযোগ কমিটির নেতাদের কাছে এসেছে যে, ভদ্রলোকের নিজের ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই—দু-তিনজন অধ্যাপক যে ভাবে বলেন সেই ভাবেই তিনি চলেন। অনেক গর্হিত কাজও তাঁকে দিয়ে তাঁরা করিয়ে নেন। আর তাঁদের পাণ্ডা হলেন স্বয়ং ভাইস প্রিন্সিপাল গোবিন্দ সাধুখাঁ। সকল অকাজের কাজী তিনি। অতিশয় কূটনৈতিক বুদ্ধির পাণ্ডা!

অবশ্য তাঁর কাজ-অকাজের দীর্ঘ তালিকার মধ্যে দু-একটা ভালো কাজ যে একেবারেই নেই, তা বলা চলে না। আর কিছু না হোক, মহিলা বিভাগের অধ্যক্ষপদে মিস মজুমদারের মতো কৃতী মহিলা পাওয়া সম্ভব হয়েছে এই সাধুখাঁরই জন্যে এবং সেখানেই তিনি বাজীমাৎ করে বসে আছেন। কলেজ কমিটির ওপর প্রভাব তাঁর বেশ খানিকটা বেড়েছে শুধুমাত্র এজন্যে।

কমিটির অনেক সদস্যের সঙ্গেই ভাইস প্রিন্সিপালের খুব দহরম-মহরম। তা লক্ষ্য করে অধ্যাপকদেরও বেশ বড়ো একটা দল তাঁর প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখিয়ে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় মশগুল। প্রকাশ্যেও সাধুখাঁর কৃতিত্ব কীর্তনে কোনোরূপ কুণ্ঠা নেই তাঁদের। এমন কি প্রিন্সিপালকে শুনিয়ে শুনিয়েই, কখনো কখনো তাঁর সামনেই সে গুণ-কীর্তনে তাঁরা মেতে ওঠেন। অন্য অধ্যাপকরা কাছে থাকলে তাঁদের অনেকেই হয়তো সরে পড়েন। কিন্তু এ এমনই ব্যাপার, অন্য সবাই যাই করুন না কেন, প্রিন্সিপাল ব্যানার্জির পক্ষে তো ধৈর্য ধরে কান পেতে সব না শুনে উপায়

নেই। তাঁকে বরং সহযোগীর কৃতিত্বের কথায় বাহবাই দিতে হয় মাঝে মাঝে।

অনেক কাল ধরেই চলেছে এ অবস্থা। ভেতরে ভেতরে একটা বড়ো রকমের দল তৈরি করে নিয়েছেন সাধুখাঁ। কিন্তু তাঁর নিজের বাইরের ব্যবহার কিন্তু নিখুঁত। পিন্সিপালকে তিনি এমনভাবে আগলে থাকেন যাতে মনে হবে, এমন বশংবদ সহকারী হয় না কখনো। কিন্তু অধ্যাপক ব্যানার্জির অধ্যক্ষপদ লাভ করার পর থেকেই তাঁকে সেখান থেকে হঠানোর একটা গভীর চক্রান্ত চলে আসছে অতি সুকৌশলে। প্রিন্সিপাল যে এতো দিনের এ ব্যাপার কিছু বোঝেন নি তা নয়, তবে ভাইস প্রিন্সিপালের পরামর্শ মতো চলা তাঁর যেন কতকটা মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে, এই মুশকিল!

তবে এবার যে করেই হোক, অর্থনীতির অধ্যাপক পদে সম্পূর্ণ-ভাবে একজন নিজের লোককে বসাতে পারায় একটা যেন মস্ত কাজ করে ফেলেছেন প্রিন্সিপাল ব্যানার্জি। তাঁর প্রতি যাঁরা অনুরক্ত ঠিক সেভাবেই ভাবেন তাঁরা। আর ঠিক এজন্যে মনে মনে সাধুখাঁর ভীষণ ক্ষোভ। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর বা তাঁর দলের কারো জানাশুনো কাউকে বসিয়ে দেবেন এই নতুন পদে। কিন্তু প্রিন্সিপাল যে তাঁকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে এতো চটপট সুবিমলকে নিয়ে ফেলবেন তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তার জন্যেই তাঁর চাপা ক্ষোভের এতো তীব্রতা এবং তাঁর চেলা-চামুণ্ডাদের মধ্য দিয়ে সে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

এই পরিবেশের মধ্যেই দিনের পর দিন কাটে। ছাত্রমহলে ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন সুবিমল। এমন বন্ধুর মতো ব্যবহার যে অধ্যাপকের, পড়ানোর পদ্ধতিও যাঁর এতো আকর্ষণীয়, ছাত্রদল তাঁকে যে ঘিরে থাকতে চাইবে তা তো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তারই জন্যে আবার আর একদিক

থেকে সুবিমলের বিরুদ্ধে সমালোচনার মাত্রাটাও বেড়েই চলেছে দিন দিন।

সেদিন প্রফেসর মুখার্জি তেমনি ধরণের সমালোচনা কানে যেতেই তার প্রতিবাদ না করে আর পারলেন না। ইংরেজি ভাষার একজন তরুণ অধ্যাপক তিনি। ভদ্রলোক বছর দুই মাত্র এসেছেন এ কলেজে। কিন্তু এরই মধ্যে দলাদলির আবহাওয়ায় তিনি বীতশ্রদ্ধ। ছেড়ে চলে যাবার একটা সুযোগ পেলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন, তাঁর মনের এই অবস্থা।

মুখার্জি যাচ্ছিলেন ক্লাসে। দেরিতে ক্লাস নেওয়ায় তিনি অনভ্যস্ত। সেটা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। ক্লাসে যাবার পথে দেখেন তাঁর কয়জন সহকর্মী বারান্দায় আলাপ-মত্ত দুই নম্বর রুমের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁরা তিন জন। ইতিহাসের অধ্যাপক সত্য হালদার, অংকের অবিনাশ মোদক আর কমার্শিয়াল জিওগ্রাফির অক্ষয় চক্রবর্তী। আলাপ মানে তাঁরা সবাই মিলে সুতীব্র সমালোচনা করছিলেন সুবিমলের।

প্রিন্সিপাল এমনি একটা ছোকরাকে ধরে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলেন অধ্যাপক করে, এখন আমাদের মান-সম্মান বাঁচিয়ে চলাই দায় হয়ে উঠলো দেখছি।—বেশ একটু বড়ো গলায়ই সত্য হালদার বলছিলেন একথা।

ঠিক তাই। প্রবীণদের প্রতি সুবিমলের নিজেরও কোনো রেসপেক্ট নেই, ছাত্রগুলোও ওকে অনুসরণ করে এরই মধ্যে তেমনি উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে।—হালদারের কথায় এই বলে সায় দেন অবিনাশ মোদক। তিনি অংকের অধ্যাপক। তাঁর একেবারে হিসেব মেলানো কথা।

চক্রবর্তীও চুপ করে থাকার পাত্র নন। বাঙালীর অধঃপতনের কারণ যে তার বাবুগিরি, একথা ছাত্রদের তিনি প্রায়ই বলে থাকেন। আর কি না একজন সেরা বাবুকেই অধ্যাপক হিসেবে

আমদানী করে নিয়ে এলেন স্বয়ং প্রিন্সিপাল। তিনি একটু উত্তেজনার সঙ্গেই বলে উঠলেন, জামা-কাপড়ের বাহার দেখেছেন সুবিমলের ?

ঠিক সে সময়েই পেছন থেকে এসে হাজির হলেন বলাই মুখুজ্যে। বলাই বাবুর বয়েসও অল্পই—বছর তিরিশ। তাহলেও তিনি যেমনই সুবিবেচক তেমনই সুবিজ্ঞ। অত্যন্ত সৎ এবং শুদ্ধ স্বভাবের লোক। প্রিন্সিপাল ব্যানার্জি সজ্জন বলেই তিনি তাঁর সমর্থক। কিন্তু তাঁর দুর্বলতার ঘোর প্রতিবাদ করেন তিনি সময় সময়। কাউকে অযথা যেমন তিনি আঘাত করেন না, আবার যা সত্য তা বলতে কাউকে পরোয়াও করেন না। তাই অনেকে তাঁকে ভয় করে, আবার অনেকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালোও বাসে।

সেই বলাই মুখুজ্যে সামনে এসে হেসে বললেন, সত্যদা, আপনারা সুবিমলের ব্যক্তিগত চালচলন আচার-আচরণটাই বড়ো করে দেখছেন কেন, তাঁকে আনা হয়েছে পড়াতে—ছাত্ররা তাঁর পড়ানোয় খুশি কিনা, অধ্যাপক হিসেবে তিনি কেমন তাই দেখুন, তারপর তিনি ভালো কি মন্দ, সে প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে।

সত্যবাবু চটে গেলেন মুখুজ্যের কথা শুনে।

চটবারই কথা! তাঁর ভাইপোকে তিনি আনতে চেয়েছিলেন এ চাকরিতে। ভাইস প্রিন্সিপাল সাধুখাঁর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা একরকম পাকাই হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু অধ্যক্ষের নিজের ক্যাণ্ডিডেট সুবিমল। তাঁকে চট করে ডেকে নিয়ে এসে তিনি বসিয়ে দিলেন। হার হয়ে গেলো তাঁর। সেই কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিলে রাগ হবে না তো কি ?

আরো অনেক কথা বলার আছে সত্যবাবুর। নিজের ভাইপো, শুধুমাত্র এই কোয়ালিফিকেশনের জোরেই তো আর সত্যবাবু তাঁর ভাইপোকে এই কলেজে আনতে চান নি।

মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন তো তার আছেই, তার ওপরেও সে বেচারার রয়েছে বৎসরাধিক কাল ধরে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা। সে দিক থেকে বিচার করলে তাঁর ভাইপোর দাবীই অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু সে আর কি করে হবে? তাড়াহুড়ো করে কমিটিকে প্রিন্সিপাল যা বুঝিয়েছেন কমিটিও তাই বুঝেছে, আর কোনো ক্যাণ্ডিডেটের কথা তোলারই সুযোগ হয়নি। তা না হলে ব্যাপার অন্যরকম হয়ে যেতো। কমিটিতে সত্যবাবুর প্রভাবই বা কম কিসে? প্রেসিডেন্ট তাঁর নিজের বড়ো ভাইয়ের দূর-সম্পর্কের মামাশ্বশুর। তবে?

মনের তলায় এসব চিন্তা চেপে রেখে বেশ একটু উত্তেজিত সুরেই মুখুজ্যের কথার উত্তর দিলেন সত্যবাবু। বললেন, এসব ব্যাপারে তোমার মতো লোকের পক্ষে আমাদের ওপর উপদেশের লাঠি ঘুরানো মোটেই শোভন নয় বলাইবাবু! এমনি করেই অল্প কিছুদিনের মধ্যে তোমরা কয়েক জন মিলে কলেজ ডিসিপ্লিনটাকে একেবারে গোল্লায় দিলে! এ নিয়ে তোমার সঙ্গে একটি কথাও আর আমরা বলতে চাইনে। তুমি যাও।

তার মানে? আমরা কলেজ ডিসিপ্লিন গোল্লায় দিয়েছি, এ কথার অর্থ কি?—সত্যবাবুর উক্তির ব্যাখ্যা দাবী করেন প্রফেসর মুখার্জি।

কিন্তু সত্য হালদার বা তাঁর সঙ্গীদের কেউ একটি কথাও আর বলতে রাজী নন মুখুজ্যের সঙ্গে। তাই 'আচ্ছা, দেখাই যাক্!' বলে বলাইবাবুকে বিদায় নিতে হয় সেখান থেকে।

ক্রমাগত বর্ষণ চলছে কদিন ধরে। কখনো ঝুপ-ঝুপ, কখনো ঝির-ঝির। গোটা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস দুটোয় এক ফোঁটাও জল দেয়নি আকাশ। সেই অকরুণ আকাশের করুণাধারায় পৃথিবী শীতল। একটানা বৃষ্টি-বাদল কাজের মানুষের পক্ষে অনেক সময় বিরক্তকর হলেও অসহ্য দাবদাহের পর এ বর্ষণে সবাই খুশি।

প্রফেসর হালদারের সঙ্গে প্রফেসর মুখার্জির সেদিনের কথা কাটাকাটির পর মুখুজ্যে বেশ কিছুকাল হালদারের দলকে এড়িয়ে চলছিলেন। তরুণ অধ্যাপক-গোষ্ঠী ও ছাত্রদের নিয়েই তিনি তাঁর অবসর সময় কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। কলেজের আবহাওয়ায় কেমন একটা গুমোট ভাব। বেশ উত্তপ্ত, গরম।

ভাইস প্রিন্সিপাল সাধুখাঁকে আবহাওয়া-বিশেষজ্ঞ বলা যায় এক হিসেবে। কলেজ পলিটিক্সের আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারেন তিনি। কলেজ আবহাওয়ায় এই গুমোট উত্তাপের লক্ষণটা মোটেই শুভ নয়, সাধুখাঁ এটা বুঝতে পেরে একদিন সত্যবাবু ও বলাইবাবুকে তাঁর অফিসঘরে ডেকে নিয়ে দুজনকেই অনুরোধ করলেন তাঁদের মধ্যেকার গোলমাল মিটিয়ে নিতে। কিছু ফলও হলো তাতে। দুপক্ষের মন কষাকষি অনেকখানি শিথিল হয়ে এলো এর পর থেকে।

আর আশ্চর্য্যের ব্যাপার, এই মিটমাটের পরেই আকাশফাটা রোদ্দুরও যেন ঝিমিয়ে এলো এবং তার পরদিন থেকে মেঘভাঙা বর্ষণের বিরাম নেই।

বৃষ্টির জন্যে অনেক ছাত্রই অনুপস্থিত। ফাঁকা ফাঁকা ক্লাস। অধ্যাপকদেরও কেউ কেউ এসে উঠতে পারেননি। তাঁদের প্রায় সবাই দূরের বাসিন্দে। সপরিবারে গ্রামের মধ্যে বাস করেন তাঁরা।

গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে ধূ ধূ এক প্রান্তরের ঠিক মাঝখানে কলেজ। আর এই কলেজেরই একধারে ছেলেদের হোস্টেল এবং আর এক পাশে মেয়েদের। তবে মেয়েদের হোস্টেলে অধ্যক্ষ মিস মজুমদার এবং কয়েকজন অধ্যাপিকা ছাড়া ছাত্রীদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। ছেলেদের হোষ্টেলে কিন্তু তা নয়। সেখানে অর্ধ শতাধিক বেডের প্রায় সবগুলোতেই ছাত্র এবং পাঁচখানি সিঙ্গল সীটেড রুমের চারখানাতে চার জন অধ্যাপক।

হোস্টেলবাসী চার জন অধ্যাপকের মধ্যে দুজনই ব্যাচিলার—বলাই মুখুজ্যে ও সুবিমল সান্যাল, একজন বিপত্নীক—পণ্ডিত দীনদয়াল শাস্ত্রী এবং অপরজন বাংলার অধ্যাপক দূরপত্নীক চন্দ্রশেখর সামন্ত।

অধ্যাপনা ছাড়াও সামন্ত মশাইয়ের আর একটি দায়িত্ব রয়েছে। তিনি এ হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। পণ্ডিত মশাইয়ের ঝামেলা কিন্তু চন্দ্রবাবুর চেয়েও বেশি। শুধু বেশি বললে ঠিক বলা হয় না, তাঁর হাংগামা কঠিনতর। তিনি স্বপাকভোজী। কেবল তাই নয়, তাঁর জলটুকু পর্যন্ত অপর কারো স্পর্শ করার উপায় নেই—এমন কি, কোনো আত্মীয়-স্বজনেরও নয়। তাঁর কোনো জিনিষপত্রই কেউ স্পর্শ করে, তা তিনি পছন্দ করেন না। এসকল ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে গিয়ে অধ্যাপনা ছাড়া আর কোনো বিষয়েই নজর দেওয়া বা খেয়াল রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। পণ্ডিত মশাই এমনি ব্যস্ত-বিব্রত।

দূরপত্নীক হওয়ায় চন্দ্রবাবুর অবশ্য কোলকাতা-নবনগর টানাপোড়েনের দায়টা একটা বাড়তি যন্ত্রণা। তবে সে যন্ত্রণাটা মধুর বলেই এমন গা-সহা হয়ে গেছে ভদ্রলোকের যে, সপ্তাহে দুবার করে আসা-যাওয়া করতে হলেও তাঁর কোনোরকম আপত্তি হতো না। প্রতি শনিবার কোলকাতা গিয়ে সোমবারই আবার নবনগরে সকালের গাড়িতে ফিরে আসতে হয় চন্দ্রবাবুকে। প্রত্যেক সপ্তাহেই এই ছুটোছুটি চলে আসছে বছরের পর বছর ধরে। কোনো আপত্তি নেই, কোনো বিরক্তি নেই। বরং এক এক সময় মাঝ সপ্তাহেও একবার কোলকাতা ঘুরে আসবার জৈব আকর্ষণ বোধ করেন চন্দ্রবাবু। আসল কথাটা চেপে রেখেই বলেন, সংসারের সতেরো রকমের ঝামেলা, তা কি আর একদিনে মিটিয়ে আসা চলে?

আসল ব্যাপারটা যাই হোক, চন্দ্রবাবুর কথাটা একেবারে

যুক্তিহীন নয়। তবে শাস্ত্রী মশাই অভিজ্ঞ লোক। তাই চন্দ্রবাবুর কথার ফাঁক সহজেই বুঝে নিয়ে একদিন তিনি অসংকোচেই তাঁকে বলে ফেলেছিলেনঃ আরে ভায়া, বৌমাকে কোলকাতায় ফেলে রেখে খালি খালি আর এই বেহুদে কষ্ট করা কেন? এখানে নিয়ে এলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়।

না দাদা তা হয় না, বাবা-মাকে দেখাশুনো করার জন্যে ওকে কোলকাতায় থাকতেই হবে। তবে কি জানেন? ঘরের ঝামেলা যাই হোক, বাইরের ঝঞ্ঝাটও তো বড়ো কম নয়। তারই জন্যে আমায় মাঝে মাঝে কোলকাতায় ছুটতে হয় এভাবে। —চন্দ্র বাবু সেদিন উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে। আর এ উত্তর দিতে গিয়ে কিছুকাল আগের চাপা পড়ে যাওয়া একটা ঘটনার কথাও মনে পড়ে যায় চন্দ্রবাবুর। সে ঘটনার প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে তিনিও প্রস্তুত হচ্ছেন অতি নীরবে।

কম কথার মানুষ পণ্ডিতমশাই। তিনি আর কথা না বাড়িয়ে হাসির ইংগিতেই জবাব দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখরের উত্তরের।

তবে চন্দ্রবাবু সম্বন্ধে যাই বলা হোক, নবনগর থেকে শনি-বারের কোলকাতাযাত্রী সংখ্যা মোটেই আর কম নয় আজকাল। কলেজ আরম্ভ হবার কাল থেকেই এই হাল। যুদ্ধের দৌলতে স্থানীয় লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগর থেকে মহানগর এবং মহানগর থেকে নগরে লোকের যাতায়াতও যে অনেক বাড়বে, সে তো স্বাভাবিক। তাই হয়েছে।

শুধু কি তাই? কলেজের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের পরিবেশে কোলাহলও এলো এবং সে কোলাহল বেড়েই চলেছে সেই থেকে। গ্রাম হলো নগর। সোরগোল একটু না হলে নামমাহাত্ম্যেরই বা পরিচয় পাওয়া যাবে কি করে?

সত্যি কথা, ষাটঘর গ্রাম সেই যে নবনগর হলো তারপর থেকে ধীরে ধীরে সেই পুরোনো নামটি পর্যন্ত মুছে যেতে লাগলো

ঘাটঘরবাসীদের মন থেকে। একে একে ডাকঘরের নাম বদলেছে, নাম বদলেছে রেলষ্টেশনের। হাট-বাজারেরও। ঘাটঘরের নাম মানুষের মন থেকে মুছে যাবে না তো কি?

এখনো সেকেলে বুড়ো লোকদের মুখ থেকে সময় সময় গ্রামের সেই পুরোনো নামটা বেরিয়ে পড়ে। তবে নবনগর বলে ভ্রম সংশোধনও করতে হয় তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে। তা না হলে যে একালের ছেলে-মেয়েদের এবং নবাগতদের পক্ষে তা বুঝে ওঠাই দায়!

ঘাটঘর গ্রাম নগর হবার পর শহরের ভালো-মন্দ অনেক কিছুই আমদানী হয়েছে এ অঞ্চলে। বুড়োরা ভালোর তারিফ না করুন, মন্দ অনেক কিছু কল্পনা করে নিয়েও নাক সিঁটকিয়ে কথা বলেন। নানা বিষয় নিয়ে হরদম সমালোচনা করেন। আর তা নিয়ে বুড়োদের সঙ্গে স্থানীয় ছেলে-ছোকরাদের বাদ-প্রতিবাদও বড়ো কম হয়নি।

বুড়োদের মোড়ল-মুরুব্বি হরকান্ত বাগচী। অশীতিপর হলেও বাগচী যেমনি তেজী, তেমনি তার্কিক। তাঁর সঙ্গে এঁটে ওঠা ছেলে-ছোকরাদের পক্ষেও খুব সহজ ব্যাপার নয়।

অনেক দিন পর এক মওকা পেয়ে বাগচী এখন সপ্তমে চড়িয়ে নিয়েছেন তাঁর মেজাজ। ছাত্র-যুবকরা তো কোন ছার, কলেজের সেক্রেটারী মেম্বরই হোন কিংবা অধ্যক্ষ অধ্যাপকই হোন, বুঝিয়ে সুজিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করতে যাবার সাহসই নেই কারো। অথচ তাঁকে না থামালেও আর চলে না।

কদিন ধরে বাগচী মশাই তাঁর সাংগোপাংগোদের নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাটে-মাঠে এমন হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছেন কলেজের বিরুদ্ধে, যা বাস্তবিকই খুব ক্ষতিকর বলে কলেজ-কর্তৃপক্ষ মনে করেন। কেউ যদি ব্যক্তিগত কারণে কলেজ ছেড়ে চলে যান তাতে দুঃখবোধের অবকাশ থাকলেও, সেজন্যে বিচলিত বোধ করা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তা নিয়ে যদি একটা বিরুদ্ধ আন্দোলন

সৃষ্টি করা হয়, তা নিশ্চয়ই খুব চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। নবনগর কলেজের ব্যাপার নিয়েও ঠিক তেমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটা কিন্তু খুব সাধারণ। অধ্যক্ষা মিস মজুমদার কদিন ধরেই সৌদামিনী কলেজ ছেড়ে যাবেন ছেড়ে যাবেন বলছিলেন। কমিটির সবাই মিলে বাধা দিয়েছিলেন তাতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিস মজুমদার সত্য সত্যই একদিন নবনগর থেকে একেবারে উধাও হয়ে গেলেন কাউকে কিছু না জানিয়ে। পদত্যাগপত্র তাঁর আগেই পেশ করা ছিলো কমিটির কাছে। সবাইর অনুরোধ সত্ত্বেও সে পদত্যাগপত্র তিনি প্রত্যাহার করেন নি। নোটিশ পিরিয়ড শেষ হতেই তিনি বিদায় নিয়েছেন।

প্রায় মাসখানেক আগের এই ঘটনা নিয়ে আজো নবনগর সরগরম। এ নিয়ে কতোরকম জটলা জল্পনা, কতো তর্ক-বিতর্ক।

গাঁয়ে টোল ছিলো, পাঠশালা ছিলো। তারপরে ইংরেজি স্কুলও বসলো একটা। বাবুদের তাতেও আশা মিটলো না। কলেজ চাই। তাও শুধু ছেলে-কলেজে চলবে না, মেয়ে-কলেজও চাই সঙ্গে। বাবুরা এবার বুঝুন মজা। বড়ো মেম সাহেব তো কেলেংকারি চাপা দিতে না পেরে রাতের অন্ধকারে সটকে পড়ে কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছেন! আরো কতো কেলেংকারি বেরোবে আস্তে আস্তে দেখবেন এখন।—বাগচী মশাই সেই থেকে যাকে কাছে পান তাকেই এসব কথা বলে গায়ের ঝাল মেটাবার চেষ্টা করেন।

ঘাটঘর তথা নবনগরের প্রবীণতম পণ্ডিত ব্যক্তি বলে প্রাচীনরা প্রায় সবাই তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন বটে, তবে অল্পবয়স্ক বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে এমন লোকের অভাব নেই যারা বাগচীকে একথা সেকথা তুলে চটিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়। মিস মজুমদারের ব্যাপার নিয়ে নবনগরের আবহাওয়াকে গরম

করে তোলার জন্যে প্রধানত এসব লোকই দায়ী। বাগচী মশাই তো আগাগোড়াই কলেজ-বিরোধী। তাঁর কলেজ-বিরোধী প্রচারে এতোদিন কেউ ভ্রূক্ষেপও করেনি। কিন্তু এবারের ব্যাপার স্বতন্ত্র। এতে যারা বাগচীকে উস্কিয়ে দিচ্ছে তাদেরই নিবৃত্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলেজ-কর্তৃপক্ষ।

ভাইস প্রিন্সিপাল সাধুখাঁরই প্রতিবেশী বাগচী মশাই। সাধুখাঁর বাপ ছিলেন বাগচী মশাইর বন্ধু এবং বাগচীর ছেলে সাধুখাঁর অন্তরংগ।

ভাইস প্রিন্সিপাল হলেও ছেলের বন্ধু বলে বাগচী মশাই গোবিন্দ নাম ধরেই ডাকেন সাধুখাঁকে। আর সাধুখাঁ জ্যাঠামশাই বলে ডেকে আসছেন বাগচীকে সেই ছেলেবেলা থেকে। দুই পরিবারের মধ্যে পরম আত্মীয়সুলভ দুই পুরুষের ঘনিষ্ঠতা।

কিন্তু এই কলেজে চাকরি নেবার পর থেকে গোবিন্দ সাধুখাঁর ওপর ভারি বিরূপ হয়ে উঠেছেন বাগচী মশাই। সাধুখাঁ যতোবারই ঘাটঘরে কলেজ প্রতিষ্ঠার ভালো দিক দেখিয়ে কথা বলতে চেয়েছেন, অপর দিকের বিরূপতাও ততোই বেড়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, কিছুকাল ধরে দুজনের প্রায় কথাবার্তা বন্ধ।

তবে দু বাড়ির মেয়েদের মধ্যে যাওয়া-আসা বন্ধ হয়নি তার জন্যে। বাগচী-গৃহিণীর আকর্ষণ বরং আগের চেয়েও যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে সাধুখাঁর বাড়ির ওপর। ঘরে ভালো মন্দ যখনি যা তৈরি হোক, তার কিছুটা নয়া বৌমার হেঁসেলে যাবেই। নয়া-বৌমা মানে সাধুখাঁর স্ত্রী আরতি। আট বছর আগে বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এখনো তাঁর 'নয়া' বিশেষণ থেকে মুক্তি নেই। আর বাগচীর ছেলে-বৌ অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথের স্ত্রী জাহ্নবী বছর দশ আগে এসেছে বাগচী-বাড়িতে। শুধু শ্বশুর-শাশুড়ীর ডাকই নয়, সাধুখাঁদের বাড়িতেও তাঁর পরিচয় বড়ো বৌ বলে।

বড়ো বৌ আর নয়া বৌতেও খুব ভাব। কোলকাতায় মহেন্দ্র-নাথের কাঠের গোলা। বি-এ পাশ করে আর না পড়ে ব্যবসায়ে নেমেছেন তিনি এবং ব্যবসায়ে বেশ ভালোই আয় করছেন। ক্বচিৎ কখনো বাড়িতে আসেন, কিন্তু তাতেও অনেক সময়ের অপচয় ঘটে বলে শীগগির আর তাঁর নবনগরে আসা হবে না, এ কথা তিনি মাস দুই আগে জানিয়ে গিয়েছেন।

সত্যি সত্যি গত দু মাসের মধ্যে একবারও বাড়ি আসেন নি মহেন্দ্রনাথ। ব্যবসায়ে মশগুল। মাঝে মাঝে তিনি বলেন, ব্যবসায়ে যে কি মধু, বাঙালীর ছেলেরা তা টের পায় না বলেই সেদিকে এগোয় না। এ মধুর সন্ধান একবার পেলে সহজে কি আর মন অন্য দিকে যায়?

এ কথার মধ্যে বিন্দুমাত্রও মিথ্যে নেই মহেন্দ্রনাথের। তবে ব্যবসায়ের মধু-চাক ফেলেও ব্যবসায়ীকে এদিক ওদিক মাঝে মাঝে ছুটতে হয়। এ সংসারে তার চেয়েও বড়ো আকর্ষণ কিছু কিছু আছে বৈ কি।

সে জন্যেই এবার মহেন্দ্রনাথকে ছুটে আসতে হয়েছে নবনগরে। তা না হলে হয়তো আরো অনেক দেরি হতো আসতে।

মহেন্দ্রনাথের ছোটো ছেলের মুখেভাত। বড়ো ছেলের মুখেভাতও বেশ ঘটা করেই করা হয়েছিলে বাগচী-বাড়িতে। তবে এবারের সমারোহ আরো বেশি। বাগচী মশাই নিজের ছেলের ব্যবসায়িক উন্নতিতে ভারি খুশি। তাই তাঁর নাতির অন্নপ্রাশন উৎসবে তিনি যে খুব জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবস্থা করবেন সে তো স্বাভাবিক। আর সত্যি সত্যি তাঁরই উদ্যোগ-আগ্রহেই এতো সমারোহ, এতো হৈ-চৈ।

খুবই একটা শুভ মুহূর্তে আমার এ নাতিটার জন্ম।' তা নইলে ওর জন্মের পর থেকে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মহেন্দ্রের ব্যবসা শাখা-প্রশাখায় এতোটা ছড়িয়ে পড়তে পারতো না!—এমনি ধরণের

কথা ইদানীং হামেসাই বলেন বাগচী মশাই। রোজই সকালবেলায় তিনি বেড়াতে বেরোন ছোটো নাতিকে কোলে নিয়ে। যাঁর সঙ্গেই দেখা হোক, দু-চারটে কথা তাঁকে শুনতেই হয় তাঁর কাছ থেকে তাঁর এই নাতি সম্পর্কে।

শুধু তাই নয়, তাড়াহুড়ো দেখিয়ে সটকে না পড়তে পারলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুফল সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞানলাভ না করে সহজে ছাড়া পাওয়া যায় না বাগচী মশাইয়ের কাছ থেকে। কলেজে পড়ে অকারণ সময় নষ্ট না করে অল্প বয়েস থেকে ব্যবসায়ে হাত পাকানো উচিত বাঙালী ছেলেদের, এই হলো তাঁর আসল বক্তব্য।

এই আমার মহেন্দ্রের কথাই বলি, বি-এ ডিগ্রীটার লোভে চার চারটা বছর যদি সে নষ্ট না করতো তা হলে সে আরো বড়ো হতে পারতো না ব্যবসায়ে? কোন কাজে লাগছে তার ঐ বি-এ ডিগ্রী?—গ্রামের সবাইকে এমনি ভাবেই তিনি বুঝিয়ে আসছেন অনেক দিন ধরে। ষাটঘরে কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতারও এই কারণ। কিন্তু বাঙালীর যতো কল্যাণকামীই হোন তিনি, তাঁর কথা যে অরণ্যে রোদন মাত্র হয়ে চলেছে, এ তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। তবে তাঁর ক্ষোভ কেবলি বেড়েই চলেছে তাতে। সাধুখাঁর সঙ্গে এতোটা তিক্ততার কারণও তাই।

মহেন্দ্রনাথ এসেছেন বাড়িতে। মাত্র দুদিনের জন্যে এসেছেন। ছোটো ছেলের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের একদিন আগে এসে অনুষ্ঠানের পরদিনই আবার চলে যাবেন, এই ব্যবস্থা। তাই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাশুনো করার অবকাশও খুব কম। তবে গোবিন্দের সঙ্গে সবার আগেই তাঁর দেখা করা চাই-ই। সে ব্যাপারে কোনো ভুল হবারও উপায় নেই, এড়িয়ে যাবার জন্যে কোনো অজুহাতের কথাও কখনো তাঁর মনে আসে না।

গোবিন্দ, হ্যাঁ ঠিকই দেখছি তোর শরীরটা তেমন ভালো নেই। কিন্তু তা হলেও দেখিস আবার, অনুপস্থিত হয়ে কালকের উৎসবের

আনন্দটুকু মাটি করে দিস না যেন।—সাধুখাঁর সঙ্গে প্রথমেই এসে দেখা করে বিদায় নেবার মুখে মহেন্দ্রনাথ বার বার করে বলে যায় বন্ধুকে।

আরে দূর পাগল! এ নিয়ে এতো বলার কি আছে? তোর ছেলের মুখেভাত, ১০৫° জ্বর থাকলেও ককিয়ে ককিয়ে একবার গিয়ে উপস্থিত হতাম—আর এ তো সামান্য সর্দি জ্বর আর একটু মাথা ধরা। ও কিছুই নয়, ঠিক যাবো। বাগচী মশাইয়ের সঙ্গে যে রকম মন কষাকষি চলছে গোবিন্দের, তাতে এতোটা আন্তরিকতা আশা করা যায় না তাঁর কাছ থেকে। তাই খুবই খুশি হয়েই ফেরেন মহেন্দ্রনাথ।

উৎসবের দিন সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার-ভার। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ যেন ফেটে পড়ার উপক্রম। বাগচী-বাড়িতে সবারই মন খারাপ তার জন্যে। বাগচী মশাই নিজেও কম ভাবিত নন এ নিয়ে।

হরকান্ত বাগচীর পাঁজি দেখতে ভুল হবে, এ হতে পারে কখনো? এতো করে সব গুণে মিলিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করা হলো, তার পরেও এ বিভ্রাট! নিজের মনের সঙ্গেই একটা লড়াই বেধে যায় বাগচী মশাইয়ের, তিনি চোখের চশমাটাকে একটু ভালো করে এঁটে নিয়ে পাঁজি-পুঁথির নিরিবিলি রাজ্যে গিয়ে আর একবার বসে পড়েন।

না, কোনো রকম ভুল হয়নি তো তাঁর গোণা-গুণিতে। কোনো ভাবনারই কারণ নেই। এতোক্ষণে অনেকটা নিশ্চিন্ত বাগচী মশাই।

প্রচণ্ড রকমের এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলো এর মধ্যে। আকাশ এখন অনেকটা পরিষ্কার। বৃষ্টিটার পরেই সাধুখাঁর মাথার যন্ত্রণাটাও যেন অনেক কমে গেলো। এখন তিনি বেশ উঠে বসতে পারছেন। নড়াচড়া করতেও তেমন আর কষ্ট হচ্চে না

আগের মতো। উঃ, পুরো দুটো দিন ধরে কী দুঃসহ কষ্টই না তিনি ভোগ করছেন মাথার যন্ত্রণায়!

একটু ভালো বোধ করাতেই গোবিন্দ সাধুখাঁ একবার গিয়ে ঘুরে আসেন ও বাড়ি থেকে। যা হোক সামান্য কিছু খেয়ে-দেয়ে বলেও আসেন, তাঁর পক্ষে আর হয়তো আসা সম্ভব হয়ে উঠবে না সেদিন।

না, না আর তোমার আসার কোনো দরকার নেই বাবা! তোমার রাতের খাবারটা নয়া বৌমার সঙ্গে শ্রীহরিকে দিয়েই বরং পাঠিয়ে দেবো। খুব সাবধানে থেকো বাবা! মাথার ব্যামো বড়ো খারাপ।—বাড়িতে এতো বড়ো কাজের ব্যাপার, তার মধ্যেও গোবিন্দের জন্যে এতো দুশ্চিন্তা বাগচী-গিন্নীর।

বলতে গেলে একরকম দুদিন ধরেই বাগচী-বাড়িতে কাটছে আরতির। নয়া বৌ-এর ওপর যে অনেক কাজের ভার। কাজেই ছেলে-মেয়েকে নিয়েই তাঁকে এ বাড়িতে সর্বক্ষণ থাকতে হচ্ছে। এক-আধ ফাঁকে গিয়ে তিনি দেখে আসেন স্বামীকে।

বৃষ্টিটা সময়মতোই থেমেছিলো, তাই অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটুকু মোটামুটি ঠিক মতোই হয়ে গিয়েছে। তবে নিমন্ত্রিতদের অনেকেই যে আসতে পারেনি, তা এই বৃষ্টির জন্যে। যারা এসেছে তাদের সংখ্যাও বড়ো কম নয়! সন্ধ্যার আগেই তাদের অধিকাংশ চলে গেলেও কাছাকাছির যারা রয়ে গেছে, তাদের মধ্যে হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায় আকাশে আবার জমাটি মেঘের জটলা দেখে।

রাত্তির বেলায় কি বিপর্যয় কাণ্ডই না জানি ঘটে বসে! একেবারে সাইক্লোনিক ওয়েদার।—ভগিনীপতির সঙ্গে আকাশের অবস্থা নিয়ে আলাপ করছিলেন মহেন্দ্রনাথ!

রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে দেখতেই কোথা থেকে যেন একখানি লালচে ওড়না উড়ে এসে ছেয়ে ফেলে মেঘ-ঢাকা সারা আকাশকে। আর আকাশটাও কেমন যেন নিচের দিকে নেমে আসে খানিকটা।

সবাইর মনে তাই ভীষণ আতংক।

শোনো নয়া বৌমা, আর দেরি করার দরকার নেই। ভীষণ ঝড় আসছে। অসুস্থ শরীর নিয়ে গোবিন্দ বেচারা একা ঘরে পড়ে রয়েছে। শ্রীহরিকে ডেকে দিচ্ছি, গোবিন্দের খাবার দাবার নিয়ে ওকে সঙ্গে করে তুমি এখুনি চলে যাও।—দুর্যোগের আশংকায় বাগচী-গিন্নী সন্ধ্যা থেকেই খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে যেখানে যেমন প্রয়োজন তাড়া দিয়ে চলেছেন।

আরতি আর দেরি না করে ছেলেমেয়েকে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান। অন্ধকার রাত, সঙ্গে শ্রীহরি। তবু টর্চের আলোতে পথ দেখে দেখে চলেন।

কিন্তু কে যেন তাঁদের ঘর থেকেই বেরিয়ে গেলো না! ঐ যে ছুটে চলে যাচ্ছে। চলার ভংগি দেখে ঠিক বলা যায়, ও সুপ্রীতি না হয়ে যায় না।

আশ্চর্য মেয়ে বটে, বলিহারি যাই! আমি আসছি বুঝতে পেরেই এতোটা জোরে ছুটে পালালো। ছিঃ ছিঃ বন্ধুত্বের এই প্রতিদান!—মনে মনে ভীষণ চটে যায় আরতি।

মাত্র দিন চার-পাঁচ আগে ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে সাধুখাঁর বাড়িতে। তারপর থেকেই ভাইস-প্রিন্সিপাল গোবিন্দ সাধুখাঁ অসুস্থ। কলেজে কদিন ধরে অনুপস্থিত। আর এই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়েই যতো রকম জটলা ও রটনা।

অবশ্য সব কিছু জটলা-রটনার মূলে রয়েছেন ঐ বৃদ্ধ হরকান্ত বাগচী। তিনিই সাধুখাঁর বাড়ির গণ্ডগোলের ব্যাপারটা ছড়িয়ে দিয়েছেন চার দিকে। যত্র-তত্র বলে বেড়িয়েছেন, গোবিন্দটার এরকম একটা শিক্ষার দরকার ছিলো। এবার যদি বাছাধন ঠাণ্ডা হয়।

এ কথাটাই আর একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলার জন্যে অনেকে আবার ধরে বসে বাগচী মশাইকে। আর তিনি তো মনের

ঝাল মিটিয়ে সব কথা খুলে বলার জন্যে মুখ বাড়িয়েই আছেন। প্রতিবেশীদের অনুরোধে মুখে বাগচীর যেন একেবারে খই ফোটে। তিনি বলে চলেন—

নয়া বৌমা আমাদের ভারি কড়া মেয়ে। তার বান্ধবীর সঙ্গে গোবিন্দ ফষ্টিনষ্টি করবে, তা সে সইবে কেন? নয়া বৌমার সঙ্গেই নাকি এক স্কুলে পড়তো তোমাদের মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপাল মিস মজুমদার। এক গাঁয়েরই মেয়ে ওরা দুজনে। ওদের মধ্যে ছোটোবেলা থেকেই নাকি খুব ভাব। গোবিন্দের বিয়ের সময় থেকেই স্ত্রীর বান্ধবী হিসেবে মিস মজুমদারের সঙ্গে গোবিন্দের পরিচয়। আর সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই তাকে তোমাদের মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপাল করে আনার জন্যে গোবিন্দের এতো মাথাব্যথা। বুঝলে তো এখন সব ব্যাপারটা?

আসল ব্যাপারটা বুঝবার মতো কী আর আপনি বললেন খুড়ো? আপনাদের কড়া নয়া বৌমা কি করেছেন তাই তো কিছু জানা হলো না। আর মিস মজুমদারকে মেয়ে-কলেজের প্রিন্সিপাল করে আনাতেই বা কি এমন দোষ থাকতে পারে, তাও তো জানা দরকার।—ত্রিলোচন বাঁড়ুজ্যে বেশ একটু তাতিয়ে দেন বাগচী মশাইকে।

আরে একথা আর কে না জানে যে, ষাটঘরে মেয়ে-কলেজ বসাবার জন্যে গোবিন্দ ছিলো একজন প্রধান উদ্যোগী। আর এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, এ গাঁয়ে মিস মজুমদারকে নিয়ে আসার জন্যেই ওর এই উদ্যোগ। বেশ একটা আনন্দের হাট বসানো আর কি, বুঝলে না? এক ঢিলে দুই পাখি মারার কাজে গোবিন্দ যে কেমন ওস্তাদ তাও সবাই জানে। দেখলে তো সে নয়া বৌমাকে কেমন খুশি করে নিলে তার ছোটোবেলার বন্ধুকে সৌদামিনী কলেজের প্রিন্সিপাল করে নিয়ে এসে। তারপরে তাকে নিয়ে চালাও স্ফূর্তি। বাইরে তো খুব সুনাম তোমাদের মিস

মজুমদারের। কিন্তু তার নসিবই দিয়েছে সব ফাঁস করে। বেশ ঘন ঘনই মিস মজুমদারের যাতায়াত চলছিলো গোবিন্দদের বাড়িতে। নয়া বৌমার বন্ধু, তার কাছে যায় আসে, এইতো আমরা সবাই এতোকাল ধরে মনে করে আসছি। সে দিনের সোরগোল থেকে বুঝতে পারা গেলো ব্যাপার গুরুতর। নিশ্চয়ই কোনো বেয়াদপি চোখে পড়েছে নয়া বৌমার। তাই সে চিৎকার করে বলছিলো গোবিন্দকে লক্ষ্য করে, 'এ বাড়িতে সুপ্রীতির আসা আমি বন্ধ করে দেবো একেবারে। শুধু এ বাড়িতে নয়, এই নবনগরেই আর তার থাকা চলবে না। পেটে পেটে ওর এতো বিদ্যে সে তো আমার জানা ছিলো না!'—আরতি ঘরে বসে তাঁর স্বামীকে কি গালমন্দ করেছেন না করেছেন তা এমন হুবহু কেউ শুনেছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই, তা হলেও বাগচী মশাইফেনিয়ে ফাঁপিয়ে এমনি সব কথা যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন। এবং তারই তরংগে কদিন ধরে রীতিমতো আলোড়িত হয়ে চলেছে নবনগরের সকল মহল।

বাইরে যে মিস মজুমদার ও তাঁকে নিয়ে এতোটা সোরগোল তার বিন্দু-বিসর্গও জানতেন না ভাইস-প্রিন্সিপাল সাধুখাঁ। সে সব কথা জানাতেই মিস মজুমদার তাঁর কাছে আজ এসেছিলেন মেঘ-বৃষ্টি মাথায় করে। তাঁর পদত্যাগের কথা এবং তার কারণ জানিয়ে সাধুখাঁ ও আরতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়াই ছিলো তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তাঁদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা যে সুপ্রীতির। নবনগর ছেড়ে যাবার আগে তাঁদের একবার আন্তরিক ধন্যবাদ না জানালে ভারি অন্যায় হবে, তাই এসেছিলেন। কিন্তু বন্ধুর দেখা না পাওয়ায় খুবই দুঃখ পেয়েছেন তিনি।

সাধুখাঁ আর একটু বসতে বলেছিলেন মিস মজুমদারকে। কিন্তু আরতি ঘরে থাকলে যদিও বা আরো খানিকক্ষণ তিনি থাকতে পারতেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে মিস মজুমদার আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত মনে করলেন না। চলে গেলেন।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে পড়তেই আর এক দিক থেকে যে আবার আরতি এসে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখে ফেলবেন, তা আর মিস মজুমদার বুঝবেন কি করে।

আরতি শোবার ঘরে ঢুকেই কোলের মেয়েটাকে খাটের ওপর বসিয়ে রেখে চলে যান পাশের ঘরে। শ্রীহরিও বিদায় হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

গিন্নী বাড়িতে ফিরে এলেন, বাড়ি তবু নিস্তব্ধ—এ লক্ষণ যে ভালো নয়, এ বেশ বুঝতে পারেন সাধুখাঁ। গিন্নীর মুখের দিকে তাঁর যে চোখ পড়েনি তা নয়। সে মুখ রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে যেন ফেটে পড়ছে। মেঘনত আকাশের চেয়েও সে মুখ ভারি।

কিন্তু কেন ? সেদিনও গিন্নী অকারণ এক দফা হৈ-চৈ করলেন। আর তা নিয়ে এমনই অবস্থার সৃষ্টি হলো যার ফলে মিস মজুমদারকে কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। সেদিন না হয় আমাদের দুজনের হাসাহাসিতে ওর খুব রাগ হয়েছিলো, কিন্তু আজ আবার কি হলো ?—সাধুখাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় এসব চিন্তায়।

আরতি এসে ঘরে ঢোকবার আগে সাধুখাঁ ভাবছিলেন অধ্যাপক সামন্তের কথা। অধ্যাপিকা মিসেস করুণা সাহার সঙ্গে তাঁর একটু বেশি মেলামেশা নিয়ে ভেতরে ভেতরে বেশ একটা সোরগোল উঠেছিলো। এমন কি কমিটি একরকম স্থিরই করেছিলো, সামন্তকে আর ছেলে-হোষ্টেলের সুপারিণ্টেডেণ্ট রাখা হবে না। সাধুখাঁই মাঝখানে পড়ে সমস্ত ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনিই দায়িত্ব নিয়েছিলেন দুপক্ষকে সামলানোর। সামন্তকে নিজের কাছে ডেকে এনে দু-চারঠে কড়া কথা বলেছিলেন আর মিস মজুমদারকে দিয়ে মিসেস সাহাকে সাবধান করিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে ভালোই ফল হয়েছিলো। সামন্তকেও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ থেকে অপসারিত হতে হয়নি এবং সমস্ত

ব্যাপারটাই একরকম গোড়াতেই ধামাচাপা পড়ে গেছে। আর সেই চন্দ্রশেখর সামন্তই কি না তার প্রতিদান দিলে তাঁদের বিরুদ্ধে কলেজকে উসকে দিয়ে।

প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চান নি সাধুখাঁ। কিন্তু মিস মজুমদার যখন নানা প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে বললেন, বাগচী মশাইয়ের কথায় তেমন গুরুত্ব দেয়নি কেউই—কিন্তু তলে তলে কলকাঠি নেড়ে সবাইকে যে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন সামন্ত এ কথা কলেজে আজ আর কারোই জানতে বাকি নেই—তখন আর তিনি অবিশ্বাসই বা করেন কি করে?

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় সুরু হয়ে যায় বাইরে। দুমদাম সব দরজা-জানালা বন্ধ করার হিড়িক পড়ে যায় বাড়িতে বাড়িতে। সাধুখাঁও অসুস্থ শরীর নিয়েই একে একে বন্ধ করে দেন তাঁর নিজের ঘরের দোর-জানালা। উত্তর দিকের শেষ জানালাটি বন্ধ করতে যেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন সাধুখাঁ—গেলো, গেলো, গোয়ালঘরের চালাটা উড়ে গেলো বাগচী জ্যাঠার।

সে চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসেন আরতি। কে জানে আবার কি হলো, হঠাৎ অসুখ বেড়ে গিয়ে আবার মাথায় রক্ত উঠে গেলো কি না—এই মনে করে ছুটে আসেন। কিন্তু তা নয় দেখে বেশ একটু কড়া রকমের খোঁচা দিয়েই—থাক, থাক আর ঘরদোর দেখতে হবে না, যাকে দেখার জন্যে সুযোগ বুঝে ডেকে নিয়ে এসেছিলে যাও তাকেই যেয়ে প্রাণ ভরে দেখো গিয়ে—এই বলে জানলার ধার থেকে কর্তাকে সরিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ বাইরের একটা ভয়ংকর দৃশ্য চোখে পড়ে যায় আরতির। পুকুর পাড়ের বিরাট ক্ষীরপুলি আমগাছটা মড়মড় শব্দে পড়ে গেলো মুহূর্তের মধ্যে। ক্ষীরপুলি গাছটার জন্যে আরতিও দুঃখ প্রকাশ করলেন সরবে। আরো এমনি কতো গাছ পড়েছে, ঘর ভেঙেছে কে বলবে!

সাধুখাঁ চুপ করেই থাকেন। বাইরের ঝড়েই চিত্ত চমৎকার। কি বলতে গিয়ে আবার কি বলে ফেলে ঘরেও লংকাকাণ্ড বাধিয়ে বসবেন, তার কোনো দরকার নেই।

কিন্তু সাধুখাঁ চুপ করে থাকলে কি হবে, বাইরের তাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে আরতির মনের ঝড়ও যে প্রচণ্ডতর হয়ে ওঠে। সে ঝড়ের প্রবল ঝাঁকুনিতে নিজেকে সামলে রাখতে পারেন না আরতি। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন—কি হলো শুয়ে পড়লে যে বড়ো, নিরিবিলি বাড়ি পেয়ে যাকে সাধ করে ডেকে নিয়ে এসেছিলে সে যে অনেক দূর চলে গেলো। যাও, সে হয়তো তোমার জন্যেই পথে আবার কোথাও অপেক্ষা করছে।

সাধুখাঁ আর সহ্য করতে পারেন না। তবে খুব জোরে নয়, ধীরে ধীরেই বলেন—আরতি, আমাদের এক গুরুমশাই একটা কথা প্রায়ই বলতেন। তিনি বলতেন, রাগ আর বিদ্বেষের মধ্যে ধ্বংসের বীজ লুকোনো থাকে। কথাটা ঠিক। আজকের বিক্ষুব্ধ আকাশ বাড়িঘর ভাঙছে, গাছপালা উপড়ে ফেলছে। রাগে-ঈর্ষায় মানুষও কতো কাণ্ড করে বসে, বুদ্ধিহারা হয়ে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটায়।

খুব হয়েছে, আর উপদেশ দিতে হবে না। এ তোমার কলেজ নয় যে ক্লাসে বসে ছাত্রদের যেমন ইচ্ছে বুঝিয়ে যাবে।—আরতি তেড়ে ওঠেন তাঁর কর্তার কথা শুনে।

উপদেশ নয় আরতি, তোমার বন্ধু তোমার কাছেই এসেছিলেন, এই দেখো তোমার কাছে লেখা তাঁর চিঠি।—এই বলে বালিশের নিচ থেকে এক টুকরো লেখা কাগজ বার করে তুলে ধরেন সাধুখাঁ। কিন্তু গিন্নী হাত থেকে তাঁর সে চিঠি না নেওয়ায় কিছুটা রাগের সঙ্গেই তিনি তা ছুড়ে ফেলে দেন ঘরের মেঝেয়।

চিঠির কথা শুনে কিন্তু একটু বিস্মিতই হন আরতি। কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে পড়তে পড়তে আরো বেড়ে যায় সে বিস্ময়। সুপ্রীতি লিখেছেন—আরতি, তোদের কাছ থেকে বিদায় নিতে

এসেছিলাম। তোদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তোর সঙ্গে দেখা হলো না, ভারি দুঃখিত। আর কবে দেখা হবে জানি না। উচ্চশিক্ষাও যখন মানুষের নোংরামি ও নীচতাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারে না, তখন সত্যিকারের রুচিশীল লোকের পক্ষে তা অসহ্য হয়ে ওঠে। নবনগরের শিক্ষিত মহলের সেই নোংরামিই আমাকে নবনগর ছাড়তে বাধ্য করলো। আমি আজই চললাম। এখুনি। তোদের আবার ধন্যবাদ।

আরতি হকচকিয়ে ওঠে এ চিঠি পড়ে। পাশের চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে বসে পড়ে। এক মনে কি যেন ভাবতে থাকে।

মিস মজুমদার তখন নবনগর থেকে অনেক দূরে। গাড়ি ছেড়ে গেছে অনেকক্ষণ। সাধুখাঁদের বাড়ির একটু দূরেই ষ্টেশন। ষ্টেশন থেকেই তিনি এসেছিলেন সাধুখাঁদের সঙ্গে বিদায়-সাক্ষাতের জন্যে।

মোট তিনখানা চিঠি লিখে গিয়েছেন মিস মজুমদার। বন্ধু আরতিকে, কলেজ কমিটির সেক্রেটারীকে এবং অধ্যাপক সুবিমল সেনকে। প্রথম দুখানাকে চিঠি না বলে চিরকুট বলাই ভালো, শেষখানি অবশ্য সত্যিকারের চিঠি।

সূর্যকান্ত কলেজের নতুন অধ্যাপক সুবিমল। তাঁকে কেন্দ্র করেও যে শুরু থেকেই একটা চক্রান্ত চলেছে তা টের পেয়েছেন মিস মজুমদার। সুবিমলের সঙ্গে দুবার তাঁর সামান্য দু-চারটে কথাও হয়েছে। কিন্তু সে এমন কিছুই নয়। তবে চলে যাবার আগে তাঁর বার বার মনে হয়েছে, সুবিমলকে একটু সাবধান করে দিয়ে যাওয়া ভালো। তাছাড়া অতীত স্মৃতির ছায়াছবি সামনে একটু তুলে ধরলে তাঁরও একটু অবাক লাগবে বৈ কি। হয়তো খুব আনন্দও হবে। এসব নানা কথা ভেবেই সারা দুপুর বসে মিস মজুমদার চিঠি লিখেছেন সুবিমলকে।

সে এক দীর্ঘ চিঠি। অতীত ও বর্তমানের অপরূপ ব্যাখ্যা-পত্র

একখানা। ভবিষ্যতের দিকে হাতছানিও রয়েছে একটু। অনেক ধানাই-পানাই-এর মধ্যে মোদ্দা কথা সব শুদ্ধু তিনটি। মিস মজুমদার লিখেছেন :

আপনার হয়তো আমায় দেখেও মনে পড়েনি যে, একই কলেজে বেশ কিছুকাল পড়েছি আমরা। এক ক্লাস ওপরের ছাত্র বলে আপনার সঙ্গে সহজ মেলামেশা সম্ভব ছিলো না আমার পক্ষে। তবু কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতার মধ্য দিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে মন-বিনিময়ও যে হয়েছিলো, সে কথা কি আর স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে ?

চিঠির এ অংশটুকু পড়েই দেশলাই কাঠিতে আগুন জ্বলে ওঠার মতোই কেমন যেন হঠাৎ একটা আলো জ্বলে উঠলো সুবিমলের স্মৃতির দৃষ্টিতে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তারই জন্যে মিস মজুমদারকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছিলো। স্মৃতি-প্রদীপের আলোয় সুবিমল তাঁর কলেজ-জীবনের গোটা অতীতকে দেখতে লাগলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে।

এই সেই সুপ্রীতি মজুমদার! সুবিমল কেবল ভাবেন এবং বার বার কেবল মিস মজুমদারের চিঠিখানাই পড়ে পড়ে সময় কাটান।

চিঠির এক জায়গায় কিছু সাবধান-বাণী রয়েছে সুবিমলের জন্যে। গাঁয়ের মানুষ যেমনি ভালো, তেমনি কূটবুদ্ধির অভাবও নেই তাদের মধ্যে। কলেজে তাঁকে নিয়ে একটা চক্রান্ত চলছে। সে সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার, এ কথাটাই মিস মজুমদার জানিয়ে দিয়েছেন। আর জানতে চেয়েছেন, কোলকাতার কোনো নতুন কলেজে চ্যান্স পেলে সুবিমল নবনগর ছেড়ে চলে আসতে রাজী কি না।

নবনগর ছেড়ে যাবার জন্যে তো উন্মুখই হয়ে আছেন সুবিমল, তিনি কোলকাতায় কাজ নিতে রাজী কি না, সে কি আবার একটা প্রশ্ন ?

তবে সতর্ক হলেই যে এখানকার বন্ধুদের সমালোচনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে তেমন কোনো ভরসা নেই। অধ্যাপক মুখার্জিও সুবিমলকে কয়েক দিন আগে চায়ের টেবিলে বসে সে কথাই বলেছিলেন। তা হলেও আবহাওয়া বুঝতে পেরেই সকলের সঙ্গে খুব সাবধানেই কথাবার্তা বলেন সুবিমল। চলাফেরায় আচার-আচরণেও তাঁর খুব সতর্কতা। তাঁর কেবলই ভয়, বড়ো রকমের কোনো অপযশ নিয়ে শেষে তাঁকে কলেজ ছাড়তে না হয়।

সেক্রেটারীর কাছে যে চিরকুটখানি দিয়ে গিয়েছেন মিস মজুমদার, তা নিয়ে পরদিন সারা কলেজে মহা সোরগোল। শুধু কলেজে নয়, সারা নবনগরে। বাগচী মশাইয়ের কানে একবার কথাটা গিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা যে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র সে তো জানা কথা। হয়েছেও তাই। বাগচীর সঙ্গে হঠাৎ বাজারে দেখা চন্দ্রশেখরের। মিস মজুমদারের উধাও হবার খবরটা টুক করে বাগচীকে জানিয়ে দিয়ে সুরুৎ করে সেখান থেকে সরে পড়েন সিদ্ধান্ত। ব্যস তার পর থেকে হাটে মাঠে ঘাটে যা হবার তাই হচ্ছে কদিন ধরে। জনসাধারণের মুখে মুখে, ছাত্রমহলে এমন কি অধ্যাপক মহলেও যেন একমাত্র আলোচ্য সাধুখাঁ-মজুমদার প্রসংগ।

হঠাৎ একদিন তারই প্রতিবাদ এলো এমন একজনের কাছ থেকে যাতে অধ্যাপকমণ্ডলীর সবাই অবাক। প্রফেসার্স লাউঞ্জে বসে শাস্ত্রী মশাই কালিদাস কাব্যের কি একখানি ভাষ্য পড়ছিলেন খুব মন দিয়ে। অন্যান্য অধ্যাপকদের আলোচনা এমনই চড়া সুরে উঠছিলো, যাতে তিনি বিরক্তি বোধ করছিলেন। হঠাৎ শাস্ত্রী মশাই একবার বলে উঠলেন :

এ যে আচার্য-পীঠ, এ কথা আপনারা বোধহয় ভুলেই গেছেন। মানুষ তো আর ইট-কাঠের তৈরি নয়, রক্ত-মাংসে গড়া। কোথাও

কারো যদি কোনো বিচ্যুতি ঘটে তা নিয়ে আর যেখানেই হোক আমাদের এখানে দিনের পর দিন এ ধরণের আলোচনা চালানো মোটেই শোভন বা সুরুচির পরিচায়ক নয়।—এই বলেই কপালে তুলে নেওয়া চশমাটাকে প্রায় নাকের ডগায় নামিয়ে নিয়ে আবার বই পড়তে শুরু করেন পণ্ডিত মশাই। সঙ্গে সঙ্গে ভাইস প্রিন্সিপালের অসুস্থতা এবং অধ্যক্ষা মিস মজুমদারের পলায়ন প্রসংগের আলোচনাও ঝিমিয়ে আসে।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি। নবনগরের কলেজপাড়া নীরব নিঝুম। ছুটির পর কোলকাতা থেকে আর নবনগরে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই সুবিমলের। ছুটির আগেই নবনগর থেকে কোলকাতার কয়েকটি কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন সুবিমল। এবার তারই মধ্যে দুজন প্রিন্সিপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একজনের কাছ থেকে একরূপ পুরোপুরি আশ্বাসই পেলেন তিনি।

কলেজ খোলার তিন-চারদিন বাদেই ঐ কলেজ থেকে পাকা চাকরির চিঠি পেলেন সুবিমল। তাঁর আকাঙ্ক্ষা এতো দিনে পরিতৃপ্ত।

কোলকাতায় ফিরে এসেই মিস মজুমদারের সঙ্গে সুবিমল দেখা করেছেন। সেই অতীত স্মৃতির সূতো টেনে টেনে দুটি মনকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে ফেলেছেন ওরা। সুবিমল ভারি খুশি তাঁর পুরোনো বান্ধবী নতুন কাজে বহাল হতে চলেছেন শুনে। প্রথম দিনই সেই সুখবরটা তাঁকে জানিয়েছেন মিস মজুমদার।

কিন্তু মাস দুই পর দক্ষিণ-কোলকাতার নতুন গার্লস কলেজে তিনি যখন যোগদান করলেন প্রিন্সিপাল হিসেবে, তখন আর তিনি মিস মজুমদার নন, তখন তিনি মিসেস সেন—অধ্যাপক সুবিমল সেনের স্ত্রী।

কাম্বালা হিলে একটানা কয়েকখানা পাঁচতলা বাড়ি। তারই মধ্যে একখানা বিশেষ কারণে বিশিষ্ট।

নিরিবিলি এলাকা। এ পাড়ার বাড়িগুলো যেন আরো নীরব নিথর। ছোট ছোট পরিবার এক এক বাড়ির এক এক ফ্ল্যাটে। অটোমেটিক লিফটে ওঠানামা। আর প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে এক বা একাধিক মোটর গাড়ি। কেউ বড়ো চাকুরে, কেউ বা ব্যবসায়ী। সবাই আপন আপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কাজেই হাঁক-ডাক, হৈ-হুল্লোড়ের কোনো বালাই-ই নেই।

একেবারে দক্ষিণ ধারের বাড়িটাতেই থাকেন অরবিন্দ সোম। ওপর-তলার ফ্ল্যাটের একক বাসিন্দে। বিচিত্র মানুষ এই অরবিন্দ। প্রয়োজনের একটিও বেশি কথা তিনি কখনো বলেছেন, এমন দুর্নাম তাঁর কেউ দিতে পারবে না। আফিসেও যেমন গুরুগম্ভীর, বাড়িতেও তাই। আর বাড়িতে কার সঙ্গেই বা কথা কইবেন। একটি মাত্র ভৃত্য নিয়ে সংসার। ঘর-গোছানো আর রান্নার ব্যবস্থাপনা নিয়েই ভৃত্য সুধাময়ের সর্বক্ষণ ব্যস্ততা। আর অরবিন্দের হাতে সময় তো সকালে মাত্র দুঘণ্টা, বাড়ি ফিরতে আবার সেই রাত নটা। কাজেই সুধাময়ের সঙ্গে তাঁর গড়ে দিনে দু-তিনটে কথা বলারও অবকাশ হয় কিনা সন্দেহ।

একটা বীমা কোম্পানীর ম্যানেজার অরবিন্দ। এ্যাকাউন্টেন্ট থেকে ম্যানেজারের গদীতে পদোন্নতি হয়েছে দুবছর আগে। এ দুবছরের মধ্যেই তাঁর যথেষ্ট সুনাম হয়েছে ডিরেক্টর বোর্ডের কাছে। কর্মচারী ও বড়ো বড়ো আনামতকারীরাও তাঁর গুণমুগ্ধ।

কিন্তু তাঁরা সবাই বিস্মিত ম্যানেজারের জীবন-যাপন ব্যবস্থার অপরিবর্তনে।

নয় বছর সময় বড়ো কম নয়। সেই সুধাময়কে নিয়ে দীর্ঘ নটা বছর একই বাড়িতে একভাবে কাটিয়ে দেওয়া কী করে যে সম্ভব, সহকর্মীদের এবং বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই তা ভেবে উঠতে পারেন না। এ নিয়ে অনেক সময় অনেক আলোচনাও হয়, কিন্তু সে সম্পর্কে কোনো জবাব বা উত্তর আসে না অরবিন্দের দিক থেকে।

বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা খুবই কম অরবিন্দের। সায়েবের বন্ধু হিসেবে সুধাময় যে দু-চার জনকে জানে, তার মধ্যে সুকমলবাবুর সঙ্গেই সায়েবের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করেছে সে। সুকমল নিয়োগীও অরবিন্দের মতোই চিরকুমার। হয়তো তার জন্যেই দুজনের মধ্যে এতোটা মনের মিল।

নিয়োগী প্রায়ই খুব সকালে চলে আসেন অরবিন্দের কাছে। এক সঙ্গে বসে সকালে চা খান। খবরের কাগজ পড়েন। শেলফ থেকে দু-একখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। দু-চার পৃষ্ঠা পড়েও ফেলেন হয়তো। কোনো কোনো দিন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভোরের সমুদ্রের দৃশ্য দেখেন নিয়োগী। ভারি সুন্দর ও শান্ত রূপ বম্বের সমুদ্রের। নিয়োগীর কবি-মন আরব সাগরের নীল নির্জনতায় যেন ডুবে যায় এক একদিন। তাঁকে ডেকে এনে বসাতে হয় চায়ের টেবিলে। কিন্তু এতো সব সত্ত্বেও কথাবার্তা যে খুব বেশি হয় দুই বন্ধুর মধ্যে তা মোটেই নয়। মাঝে মাঝে প্রশ্ন আর উত্তর। পাল্টা প্রশ্ন আর পাল্টা উত্তর। ব্যস।

তবু সত্যি কথা বলতে কি বম্বে শহরে অরবিন্দের সত্যিকারের বন্ধু বলতে এই নিয়োগী। সুধাময়েরও এই ধারণা। আর যাঁরা আসেন অরবিন্দের কাছে তাঁদের অধিকাংশই আসেন নিজ নিজ কাজ হাসিল করতে। কেউ কেউ আসেন আবার সোম সায়েবের সঙ্গে একটু খাতির জমাতে।

সেদিন ছিলো শনিবার। সতীনাথকে নিজেই স্টেশনে রিসিভ করতে গিয়েছেন অরবিন্দ।

কলেজ-জীবনের বন্ধু। খুবই ভাব ছিলো দুজনের মধ্যে কলেজ-জীবনে। কর্মজীবনে আর তেমন দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ না হলেও চিঠিপত্রের আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায়নি তাঁদের মধ্যে। অবশ্য সে যোগাযোগ যে খুব ঘন ঘনই ঘটে থাকে তাও মোটেই নয়। তবে উভয়েই উভয়ের খোঁজ-খবর রেখে আসছেন গত বারো বছর ধরে। আর তাইতো সতীনাথ কোলকাতা থেকে পুনায় বদলি হবার খবর পেয়েই প্রথম জানিয়েছেন অরবিন্দকে। সোম সায়েবও অন্তত দুদিনের জন্যে বম্বেতে তাঁর বাসায় থাকার অনুরোধ জানিয়ে তার করেছিলেন সতীনাথকে। সে অনুরোধ রক্ষা করতেই তিনি বম্বেতে নামছেন পুণা যাবার পথে।

ভি-টি থেকে কাম্বালা হিল অনেকটা পথ। ভি-টি মানে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস। এ দেশের সেরা রেলওয়ে স্টেশন এই ভি-টি। অনেক ব্যাপারেই বম্বের লোকেরা এমনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে।

বম্বের গেট অব ইণ্ডিয়া বা মেরিন ড্রাইভের মতো সুন্দর দৃশ্য আর কোথায় আছে ভারতবর্ষে? বম্বের অধিবাসীরা গর্ব করে এই বলে। এখানকার কর্পোরেশন হলে ঢুকলেই প্রথম চোখে পড়বে নিয়ন লাইটের আলোয় জ্বল জ্বল করছে 'Prima Urba' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নগরী। আরো এমনি কতো কি? অনেক ক্ষেত্রে এসব দাবি যে উপেক্ষণীয় নয় তা মনে মনে স্বীকার করেন সতীনাথ। বম্বে শহরে এই তার প্রথম পদার্পণ। কিন্তু অরবিন্দের পাশে বসে স্টেশন থেকে কাম্বালা হিলে যেতে যেতে শহরের যে পরিচ্ছন্নতা, শহর-বাসীদের যে সংযম ও শৃঙ্খলাবোধ তিনি লক্ষ্য করেছেন তাতে সত্যি সত্যি একটা শ্রদ্ধার ভাব এরই মধ্যে তিনি পোষণ করতে শুরু করেছেন বম্বে সম্বন্ধে।

বাঃ তুমিও এসে গিয়েছো এরই মধ্যে। এই যে ডক্টর, ইনি আমার বন্ধু শ্রীসুকমল নিয়োগী। আমার মতো বাউণ্ডুলে অর্থাৎ সংসার বহির্ভূত জীব হলেও ইনিই বম্বে শহরে আমার একমাত্র গার্জেন বলতে পারো।—ঘরে ঢুকেই নিয়োগীকে দেখতে পেয়ে খুশিই হন অরবিন্দ। নিয়োগীর সঙ্গে সতীনাথকে ভিড়িয়ে দিয়ে সরে পড়া যাবে, এও তাঁর আনন্দের এক কারণ। আর সত্যি সত্যি এক তরফা পরিচয় দিয়েই তিনি সরেও পড়ছিলেন। কিন্তু গায়ের জামাটা খুলতে খুলতেই সে কথাটা মনে পড়ে যায় অরবিন্দের। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এসেই বলেন তিনি—আরে যাঃ, আমার গার্জেনের কথাই যে শুধু বলেছি, ডক্টরের কথাটা বেমালুম ভুলে গেছি বলতে। এই যে ইনি ডক্টর সতীনাথ মিত্র, আবহাওয়া-তত্ত্বের গবেষণা করে ডক্টরেট পাওয়া পণ্ডিত। নাও নিয়োগী ভায়া, তোমাদের পণ্ডিতে পণ্ডিতে মানাবে ভালো। আমার আবার এদিকে আফিসের তাড়া।—এই বলে আবার পাশের ঘরে ঢুকে পড়েন অরবিন্দ।

ম্যানেজার মানুষ। তার ওপর অবার শনিবারের আফিস। একটু বেশি তাড়াহুড়ো আছে বৈকি। তবে এসব সত্ত্বেও এটাই হলো আসল কথা যে, আদপেই কম কথার মানুষ অরবিন্দ।

সতীনাথও প্রথমে এ ব্যাপারে কোনো রকম অস্বাভাবিকতা আছে বলে মনে করতে পারেন নি। নিয়োগীকে পেয়ে তাঁর সঙ্গেই তিনি প্রাণ খুলে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন।

কদ্দিন আছেন আপনি বম্বেতে?—সতীনাথ জিগ্যেস করেন নিয়োগীকে।

তা আমার প্রায় বছর দশেক হলো এখানে।

বাঙলা দেশের সঙ্গে যাতায়াতের সম্পর্কটা বজায় আছে তো, না কি স্থায়ী বাসিন্দে হয়ে গেছেন এখানকার?

কী যে বলেন ডক্টর মিত্র, মেসবাসীদের কি আর স্থায়ী-অস্থায়ী অবস্থা বলে কিছু থাকতে পারে।

তা যা বলেছেন। তবে অরবিন্দ বা আপনি যে কেন এ ধরণের জীবনকে আঁকড়ে আছেন তাতো বুঝতে পারছিনে কিছু।

অরবিন্দের সঙ্গে আমার নামটাকে আর ব্র্যাকেট করবেন না। ওর সংসার না করার কোনো মানেই হয় না। পয়সা আর প্রভাব-প্রতিপত্তি দুই-ই যার আছে তার স্থায়ীভাবে সংসার পেতে নেওয়ার অসুবিধেটা কোথায়?

আপনারই বা কী এমন অসুবিধে?—প্রশ্ন করেন সতীনাথ।

আমার কথা জিগ্যেস করছেন ডক্টর মিত্র? বম্বের স্বনামধন্য মেস ক্যালকাটা লজে যাঁরা মাথা গুঁজে থাকেন কোনো রকমে তাঁদের প্রত্যেকের জীবন সংগ্রামের কাহিনী নিয়েই এক একখানি উপন্যাস তৈরি হতে পারে। নিতান্তই করুণ তাঁদের প্রত্যেকের জীবন কথা। আর আমিও যে তাঁদেরই একজন ডক্টর মিত্র!

সে কী! অরবিন্দের এতো অন্তরঙ্গ আপনি। এতোদিন ধরে আছেন বিরাট ধনী-শহর এই বম্বেতে। আপনার মতো যোগ্য লোক এখনো বম্বেতে তেমন গুছিয়ে বসতে পারেন নি, একথা শুনেও যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

তা কেন হবে ডক্টর মিত্র? এই শহরেই যেমন সমুদ্রতীরে বিরাট তাজমহল হোটেল রয়েছে আর হর্ণবি রোডে রয়েছে ক্যালকাটা লজ, তেমনি কোটি কোটি টাকার মালিক পার্শি ব্যবসায়ী আর আমার মতো নিঃস্ব বাঙালী বা মারাঠীও অজস্র রয়েছে এখানে। এতে অবাক হবার তো কিছু নেই।

তা বটে, তবে মানুষের সাধারণ বিচার বুদ্ধিতে অনেক বিষয়ই তো সহজে ধরা পড়ে না। তার জন্যেই অনেক সময় বিস্মিত হতে হয়, বিশ্বাস করা যায় না অনেক ব্যাপার। আপনার সম্পর্কেও

আমার তেমনি যেন মনে হচ্ছে।—সতীনাথ এভাবে চাপা দিতে চান এ আলোচনা।

আরও খানিকক্ষণ ধরে সুকমল আর সতীনাথের মধ্যে একথা সেকথা চলে চা খেতে খেতে।

সায়েবের বন্ধু আসবেন কোলকাতা থেকে, সুধাময় তা জেনে আগে থেকেই তৈরি ছিলো। আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সকাল বেলার খাবার আর চা এসে হাজির হয়েছে সামনে। অরবিন্দ স্টেশনে যাবার আগেই চা খেয়ে বেরিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁকে আফিসে বেরোতে হয় সাড়ে আটটায়। কাজেই একবারেই খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি। ব্রেকফাষ্টের ওপর তাঁর আর তেমন জোর পড়ে না একমাত্র রবিবার ছাড়া।

আচ্ছা ভাই সতীনাথ, আমাকে এখন বেরোতে হচ্ছে। আজ শনিবার কিনা তাই। তাড়াতাড়িই অবশ্যি চলে আসবো। সুকমলকে বরং আটকে রেখে দাও ততোক্ষণ। একসঙ্গে বসে গল্প করো আর খাও দাও।—পুরোদস্তুর সায়েবি ঢং-এ ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধু সতীনাথের কাছ থেকে ম্যানেজার অরবিন্দ সোম বিদায় নেন এই বলে।

বাঃ বেশ চমৎকার ব্যবস্থা! আরে ভাই, তুমি নয় ম্যানেজার, ছুটে আফিসে চলেছো চুটিয়ে কাজ করবে বলে। কিন্তু আমার মতো হতভাগাকেও তো দুচারটে ম্যানেজারের কাছে ছুটোছুটি করতে হয় চাকরির দরবার করতে! আর আমাকেই তুমি আটকে রেখে যাচ্ছো।—নিয়োগী বাধা দেয় অরবিন্দকে।

সে আবার কী কথা বলছো? তোমার আবার চাকরির জন্যে ছুটোছুটি করতে হবে কেন? তোমাদের 'ইণ্ডিয়া' কাগজ তো খুব ভালো চলছে শুনি। প্রচুর বিজ্ঞাপন আসছে আর লেখার কলেকশনের জন্যেও নাকি কাগজখানি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। —উত্তর দেন অরবিন্দ।

তাতে আমার কি সুবিধে বলো। বেল পাকলে কাকের কি?

আজ আর নয় ভাই। কাল রোববার বরং সব কথা শোনা যাবে।—হাতের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দোরের দিকে এগিয়ে যান অরবিন্দ। কিন্তু রবিবার আর নিয়োগীর আসা হবে না, এলিফেন্টায় যেতে হবে কার সঙ্গে, একথা শুনে যেতে হয় তাঁকে।

এ সময়ে আপনি!—দরজা খুলে মিস সেনের মুখোমুখি হতেই আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হয় অরবিন্দকে। ঘরের ভেতর থেকে সতীনাথের চোখ পড়ে মিস সেনের দিকে। অবশ্য তা মুহূর্তের জন্যে।

পুশ ডোর। দোর ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায়। তা হলেও ঐ মুহূর্তের মধ্যেই সতীনাথ বেশ ভালো করেই দেখে নিয়েছে মেয়েটিকে। যেমনি আপ-টু-ডেট, তেমনি সার্প। কিন্তু কেমন যেন একটা অদ্ভুত রকমের কৌতূহল জাগে তাঁর মনে মেয়েটিকে আর একবার দেখবার জন্যে। হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে যেয়ে সতীনাথ বাইরের দোরটা খোলেন একবার।

কী হলো, কী দেখছেন বাইরে?—জিগ্যেস করেন নিয়োগী।

না, কে একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন যেন। অরবিন্দের সঙ্গেই বোধ হয় আবার নেমে চলে গেলেন।

ভদ্রমহিলা!

ও বুঝেছি। মিস সেনই হবেন হয়তো।

মিস সেন কে?

মিস সেন মানে শ্রীমতী দীপ্তি সেন। ঐ যে আমাদের 'ইণ্ডিয়া' কাগজের কথা শুনলেন অরবিন্দর মুখে, সেই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদিকা।

বম্বে শহরে এসে একজন বাঙালী মেয়ে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক চালাচ্ছেন, এ ভারি প্রশংসার কথাই তো বটে! আপনিও আছেন বুঝি এ কাগজের সঙ্গে?

একজন বাঙালী মেয়ের পরিচালিত কাগজ বলে অনেক

বাঙালীই কোনো না কোনো রকমে যুক্ত রয়েছেন এ কাগজের সঙ্গে। বিজ্ঞাপন দিয়ে কেউ, কেউ নগদ আর্থিক সাহায্য দিয়ে, আবার কেউ বা বিনে পয়সায় লেখা দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন 'ইণ্ডিয়া'কে। আমাদের অরবিন্দও তো একজন মস্ত বড়ো পৃষ্ঠপোষক এ কাগজের।

ও, তাই নাকি!

হ্যাঁ তাই। আমার তো আর কাউকে পৃষ্ঠপোষকতা করার যোগ্যতা নেই। তাই পৃষ্ঠপোষক অরবিন্দের কথায় একজন সেবক কর্মচারী হিসেবেই আমি কিছু দিনের জন্যে যুক্ত ছিলাম 'ইণ্ডিয়া' কাগজের সঙ্গে। কিন্তু পোষালো না, ছেড়ে দিতে হলো।

তা হলে মাইনের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন বলুন।

না, না, তা মোটেই নয়। সুকমল নিয়োগী টাকাটাকে কোনো দিনই বড়ো বলে ভাবতে পারে না। তাইতো সব সময় মাথা উঁচু করে চলা তার পক্ষে সম্ভব।

নিয়োগীর কথা শুনে মুহূর্তের জন্যে চুপ করে যান সতীনাথ। পরক্ষণেই প্রশ্ন করেন—কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন মিঃ নিয়োগী, বাঙলা দেশের বাইরে অন্তত সমস্ত ছোটখাটো বিরোধ বা মতান্তরের প্রশ্নকে এড়িয়ে চলা উচিত প্রত্যেক বাঙালীর। তাহলে বাঙালী সমাজের মর্যাদা বাড়বে বাঙলার বাইরে।

কথাটা ঠিকই বলেছেন ডক্টর মিত্র। কিন্তু যে সব বাঙালী তার সমাজগত স্বকীয়তাকে বেমালুম বিসর্জন দিয়ে গৌরব বোধ করে তাকে টলারেট করা উচিত নয়, এটা আপনি নিশ্চয় মেনে নেবেন।

তা মেনে নিলেও, আপনার মতো এক্সট্রিমিষ্ট ভিয়্যু নেওয়া সব ক্ষেত্রে উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। একটা বাঙালী কনসার্ণ, বিশেষ করে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা চালু করেছেন আপনারা এখানে। আর তা থেকে আপনি হঠাৎ বেরিয়ে এলেন সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে, এ কি খুব দুঃখের কথা নয় মিঃ নিয়োগী?

দুঃখের কথা তো বটেই, তবে সব সময়েই সব অবস্থাকে সহ্য করে যাওয়া সম্ভব হয় না ডক্টর মিত্র। কোনো রকম স্নবারিই আমি বরদাস্ত করতে পারিনে। এক শ্রেণীর লোকের ইনটেলেকচুয়াল স্নবারি আমায় উত্যক্ত করে তুলেছিলো আমার কলেজ-জীবনে। জানেন ডক্টর, তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই দশ বছর আগে আমায় কোলকাতা ছেড়ে চলে আসতে হয় এই বম্বেতে। কিন্তু এখানে এসেও নিস্তার নেই। কমার্শিয়ালই বলুন আর ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালই বলুন আর এক রকমের বিকট ও ব্যাপক স্নবারি চলছে এই শহরে। অর্থের অহমিকার সৃষ্টি এই ব্যাধি। সত্যি সত্যি অভাবী মানুষ যে তাকেও এই ব্যাধি প্রলুব্ধ করে বড়ো মানুষীর পোজ করতে। এই যে আত্মপ্রতারণার শিক্ষা, একে কি আপনি দেশের ও জাতির পক্ষে ক্ষতিকর বলে স্বীকার করেন না ডক্টর মিত্র?

খুবই সত্যি কথা। তবে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাঙালী যেভাবে পিছিয়ে পড়েছে তাতে তার ঐক্যবোধের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করার জন্যে সকলের দিক থেকেই বিশেষভাবে চেষ্টার প্রয়োজন, এ কথাটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু বাঙালী তো শুধু বাঙলা বা বাঙালীর কথাই ভাবেনি, বৃহত্তর ভারতের কল্যাণ চিন্তাই সে করে এসেছে চিরকাল। সমগ্র দেশের যেখানে যা গলদ, যা কিছু দোষ-ত্রুটি সব দূর করার জন্যেই আমাদের সমবেত ভাবে চেষ্টা করা দরকার। তাহলেই দেশের সামগ্রিক উন্নতি সহজতর হবে, বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাবতে গেলে হবে না। এ বিষয়ে আপনার কী মত, বলুন ডক্টর মিত্র।

কিন্তু বিষয়টা যে অন্যদিকে অনেক এগিয়ে গেলো মিঃ নিয়োগী। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম 'ইণ্ডিয়া' কাগজের কাজটা আপনি তাড়াহুড়ো করে ছেড়ে দিলেন কেন।

আমি কিন্তু সে কথাটা জানাবার জন্যেই আজ এসেছিলাম

অরবিন্দের কাছে। কিন্তু সে যেরকম ব্যস্ত দেখলাম, তার সঙ্গে আর কথা বলার ফুরসুৎ হলো কোথায়। অথচ তাকে না জানিয়ে কাজটা ছেড়ে দেওয়াও যে আমার ঠিক হয়নি তাও আমি স্বীকার করি। কারণ অরবিন্দই এ কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলো আমার ওপর।

বেশ তো সে কথাটাই শুনি। বলুন কেন আপনি কাজটা ছেড়ে দিলেন।

সতীনাথের আগ্রহ লক্ষ্য করে নিয়োগী সমস্ত ব্যাপারই পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করে। তাতে এ কথাটা বুঝতে আর বাকি থাকে না সতীনাথের যে, সম্পাদিকা দীপ্তি সেন বিশেষ একটা আকর্ষণ বোধ করেছিলেন সুকমল নিয়োগীর জন্যে। আর সেটা তো অস্বাভাবিকও কিছু নয়। বরং এমন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুপুরুষকে দেখে অন্তত মনে মনে সব মেয়েরই প্রেমে পড়ার কথা। কাজেই সেজন্যে মিস সেনকে মোটেই দোষ দেওয়া যায় না। নিয়োগীরও রাগ হবার কোনো কারণ থাকতে পারে না এতে। সেজন্যে রাগ বোধহয় তিনি করেনও নি।—সতীনাথের চিন্তাধারা চলে এই পথে। তবে 'ইণ্ডিয়া' কাগজের আফিস ম্যানেজার ক্যালকাটা লজে থাকলে 'ইণ্ডিয়া' সম্পাদিকার সম্মানের হানি ঘটে এবং সেজন্যে ম্যানেজারকে সম্পাদিকার হোটেলে থাকতে হবে, মিস সেনের এ প্রস্তাবে নিয়োগীর অফেন্স নেবারই কথা। কোনো বাড়াবাড়িকেই বেশি দূর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়, ডক্টর মিত্রকে মেনে নিতে হয় নিয়োগীর এ যুক্তি।

এদিকে রান্নাবান্নার পর্ব প্রায় শেষ। স্নানাদির তাগিদ আসে সুধাময়ের তরফ থেকে। আলোচনায় ছেদ পড়ে।

বিকেল বেলা তিনটে নাগাদ অরবিন্দ যখন ফিরে আসেন সে পর্যন্ত থেকে যাওয়া আর সম্ভব হয় না নিয়োগীর পক্ষে। চারটায়

কোথায় নাকি তাঁর আবার একটা এনগেজমেন্ট রয়েছে। সতীনাথের ওপরই তাই তিনি ভার দিয়ে যান তাঁর 'ইণ্ডিয়া' কাগজ ছেড়ে আসার সব কারণ অরবিন্দকে জানাবার। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয় হলেও নিয়োগীকে সত্যি সত্যি খুবই ভালো লেগেছে ডক্টর মিত্রের।

সামান্য বিশ্রামের পর অরবিন্দ চায়ের আসরে বসেন সতীনাথকে নিয়ে। ছোট ছোট প্রশ্ন করেন। আর তারই উত্তরের মাধ্যমে জেনে নিতে চান সতীনাথের কী কী দেখার ইচ্ছে, কী তাঁর প্রোগ্রাম।

আচ্ছা, নবেন্দু সান্যালের কথা মনে পড়ে তোমার ?

না, কে নবেন্দু সান্যাল ?—মোটেই মনে করতে না পেরে বিস্মিত হন অরবিন্দ।

আরে, কোলকাতায় গোবিন্দ বোস লেনে আমাদেরই পাশের বাড়ির সেই আই বি অফিসারের ছেলে। বাপের রিভলবার বিপ্লবী দাদাদের হাতে তুলে দিয়ে নবা সেই যে পলাতক হলো আর ফিরে যায়নি কোলকাতায়। ছেলেকে ধরিয়ে দিতে না পারায় আই বি অফিসারকে চোখের জলে ভিজেও চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়েছিলো। বৃটিশ আমলের পুলিশী শাসনের এমনি কড়াকড়ি! অথচ বাপই নিজে ছেলেকে সন্দেহ করে তার বিরুদ্ধেই থানায় এজাহার দিয়ে তাকে ধরাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

মনে পড়ছে না কি হে, এ প্রসংগে রামায়ণের দস্যু রত্নাকরের কাহিনীও যে মনে পড়ে যাবার কথা। রত্নাকরের পাপের অংশভাগী হন নি তার বাপ-মা। কিন্তু নবার বাপকে ছেলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে চাকরি থেকে বিতাড়িত হয়ে। স্কুলে পড়বার সময় থেকেই নবা বিপ্লবীদের আড্ডায় কি করে ভিড়ে পড়েছিলো। সেই ছোটবেলাতেই দেশপ্রেমের একটা গভীর আকর্ষণ লক্ষ্য করেছিলাম আমরা নবার মধ্যে।

ঠিক মনে পড়ছে এখন। তুমি অনেক দিন বলেছ তার কথা। তাকে আমি দেখেছিও তোমাদের বাড়িতে কয়েকবার। সেই যে পালিয়ে গেছে তারপর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তার এখনো পর্যন্ত ?

না পাওয়া গেছে। শ্রীরামচন্দ্রের চৌদ্দ বছর বনবাস জীবন যাপনের মতোই অনেকটা সে ঘটনা। দেশ যেদিন স্বাধীন হলো ঠিক সেই পনেরোই আগষ্ট তারিখেই নবা তার বাবার কাছে এক চিঠি দিয়েছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, তার সাধনা পূর্ণ হয়েছে। কাজেই আর তার আত্মগোপন করার প্রয়োজন নেই, এ কথাও সে চিঠিতে জানিয়েছে। পনেরোই আগষ্ট তারিখেই সে সকলকে জানিয়ে দিয়েছে যে, সত্যি সত্যি সে মুসলমান নয়, বিদেশী শাসকের চোখে ধূলি দেবার জন্যেই তাকে বাধ্য হয়ে পরিচয় গোপন করে চাকরি নিতে হয়েছিলো। কয়েক দিনের মধ্যেই নবা তার বাপ-মা ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাড়ি আসছে একথা চিঠিতে জানতে পেরে সারা পাড়া জুড়ে সে কী আনন্দ! কিন্তু দুঃখের কথা, নবার বাবা আর তার চিঠি দেখার অবকাশ পান নি। তাকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে এমন এক উইল রেখে তিনি বছর দুই আগে পৃথিবী থেকে অবসর নিয়েছেন যার পরে আর পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎটা সুখকর বলেও মনে হতো না।

তারপর ?—অরবিন্দ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন এই কাহিনী শুনে। আরো শোনার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তারপরে আর বিশেষ কিছুই নেই। সত্যি সত্যি নবা বাড়িতে আসে। খুঁজে খুঁজে দেখা করে ছোটবেলার পরিচিত সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে। আমার সঙ্গে দেখা করে সে যেভাবে আমায় চার বছর আগে অনুরোধ জানিয়েছিলো কখনো বম্বে গেলে তাকে একটু জানাবার জন্যে সে কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি।

তার দেওয়া ঠিকানা আজও আমার ডায়েরীতে রয়েছে। তাকে খুঁজে বার করতে পারলে ভারি ভালো হতো। তার মাও আসার সময় আমায় বলে দিয়েছিলেন।

বেশ তো, বলো না কী তার ঠিকানা।

গণেশ কুঞ্জ, মাতুংগা।—পকেট থেকে ডায়েরী বার করে নবেন্দুর ঠিকানাটা ভালো করে দেখে বলেন সতীনাথ।

তাহলে আজই তুমি যেতে চাও সেখানে? বেশ চলো।—চা খাওয়া শেষ করে অরবিন্দ ডেকে পাঠান জর্জকে বড়ো গাড়িটা বার করার জন্যে। পরক্ষণেই আবার বলেন, না, ছোট গাড়ি নিয়ে বেরোলেই চলবে, বড়ো গাড়ির দরকার নেই।

সতীনাথকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন অরবিন্দ। শুধু রবিবারই হাতে আছে সতীনাথের। কাজেই কাছের দর্শনীয় শূন্যোদ্যান ও কমলা নেহেরু পার্কটা দেখিয়ে নিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে বলে মনে করেন অরবিন্দ। তাই হয়।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই জেমি জামসেদ রোডে গণেশ কুঞ্জে এসে উপস্থিত হন তাঁরা। ছায়াশীতল পথের দুধারে ঝাউ গাছের শন শন শব্দ মুগ্ধ করে সতীনাথকে। গণেশ কুঞ্জ খুঁজে বার করতে কষ্ট হয় না অরবিন্দের।

নবেন্দুবাবু আছেন, নবেন্দুবাবু।—ছোট ফ্ল্যাট বাড়ির নিচের তলায় সামনের ঘরে কড়া নাড়তেই চার পাঁচ বছরের একটি মেয়ে এসে দাঁড়ায় দরজা খুলে। অতিথিদের সম্বর্ধনা জানিয়ে সে নিয়ে যায় ঘরের ভেতরে।

মিনিট কয়েক আগেই ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসেছে নবেন্দু। একটু বিশ্রাম করছিলো সে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে। আর হাতপাখার বাতাসে স্বামী-সেবার পুণ্যলাভ করছিলো রুক্মিণী। হঠাৎ আগন্তুকদের উপস্থিতিতে চমকে ওঠে নবেন্দুর মারাঠা স্ত্রী। রান্নাঘরের দিকে পালিয়ে যায় সে।

রুক্মিণীর এরূপ আকস্মিক পলায়নে নবেন্দুও উঠে বসে। কী ব্যাপার জানতে গিয়ে অবাক হয়ে যায় সে সামনে সতীনাথ ও তাঁর বন্ধুকে দেখতে পেয়ে।

আরে সতীনাথদা যে! হঠাৎ এ সময়ে কোত্থেকে? বম্বে এসেছেন আপনি, একটা চিঠিও তো দিতে পারতেন। আমাদের বাড়ির সব খবর ভালো তো কোলকাতায়।—এক নিঃশ্বাসে সতীনাথকে এতোগুলো প্রশ্ন করে বসে নবেন্দু।

আমি ভাই আজই এসেছি কোলকাতা থেকে। পুনায় বদলি হয়েছি। ইনি আমার বন্ধু অরবিন্দ সোম। এঁকে হয়তো এতোদিন পর আর চিনতে পারছো না, কিন্তু আমাদের বাড়িতেই ছোটবেলা দেখে থাকবে। বম্বেতে এখন মস্ত বড়ো লোক।

আরে এসব এখন রাখো ভাই। বম্বেতে এ-সব পরিচয়ের কোনোই মূল্য নেই। একজন বাঙালীর কাছে বাঙালী হিসেবেই আমার পরিচয়, তাই যথেষ্ট।—এই বলে অরবিন্দ থামিয়ে দেন সতীনাথকে।

এটি আপনার মেয়ে বুঝি। ভারি চালাক মেয়ে।

আমায় 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না অরবিন্দবাবু। সতীনাথদার বন্ধু আপনি, আমাদের চেয়ে বয়সে কতো বড়ো।

বেশ, বেশ, ঠিক আছে।—অরবিন্দ মেনে নেন নবেন্দুর কথা।

গৃহিণী রুক্মিণীকে ডেকে নবেন্দু পরিচয় করিয়ে দেয় সতীনাথ ও অরবিন্দের সঙ্গে।

বেশ পরিষ্কার বাংলা কথা বলে রুক্মিণী। মারাঠী মেয়ের মুখে এমনি বাংলা শুনে ভারি খুশি হন সতীনাথ। অরবিন্দেরও খুব ভালো লাগে। সাত বছরের বিবাহিত জীবনে সত্যি সত্যি একেবারে বাঙালী বনে গেছে মেয়েটা। নবেন্দু বাহবা পায় এজন্যে।

অভ্যাগতদের আপ্যায়নে তৎপর হয়ে ওঠে রুক্মিণী। চা তৈরি

করে নিয়ে আসে তাঁদের জন্যে। নবেন্দুর জন্যেও। আর নিয়ে আসে খান কয়েক দিশী বিস্কুট। অন্যান্য দিন কাজের শেষে রেলওয়ে কারখানা থেকে বাড়ি এসে পেটের দাবী মেটাতে আরো অনেক বেশিই খেতে হয় নবেন্দুকে। কিন্তু সেদিন সতীনাথকে কাছে পেয়ে খাওয়ার যেন কোনো তাগিদই ছিলো না তার। চা আর বিস্কুট খেয়ে নিয়ে সতীনাথের আহ্বানে সেও তাই তাঁদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে বেড়াতে।

গাড়িতে বসে অনেক রকম কথা ওঠে। একটু এগুতেই একই জায়গায় পাঁচটি পার্কের সমাবেশ বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে ডক্টর মিত্রের মনকে। 'বাঃ' বলে বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ প্রকাশ করেন তিনি।

কিন্তু ভাই, এ যে কুইনস পার্ক! এখানে এসে মুগ্ধ হতেই হবে। তা না হলে রাণী নামের মর্যাদাই যে থাকে না।—এই বলে ছোট্ট একটি মন্তব্য করেন অরবিন্দ।

বেশ তো, তা নয় হলো, রাণীর মর্যাদা রক্ষার জন্যে না হয় সবাই মিলেই মুগ্ধ হওয়া যাবে। কিন্তু রাজা বেচারার হাল দেখবার জন্যেই যেন খুব বেশি আগ্রহ বোধ করছি।—হঠাৎ বলে ওঠেন ডক্টর সতীনাথ।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন সতীনাথদা, এককে বাদ দিয়ে আর এককে ভাবাই যায় না। রাণীকে বাদ দিয়ে রাজা আর রাজাকে বাদ দিয়ে রাণী এ দুই-ই বেমানান, কেমন যেন অর্থহীন। এই একটু দূরেই মাতুংগা ট্রাম টার্মিনাসের দক্ষিণ দিকে গেলেই দেখতে পাবেন পাশাপাশি দুটি পার্ক—তারই নাম কিংস সার্কেল পার্ক।

রাজা রাণীর প্রসংগ উঠতেই আপনা থেকেই কেমন যেন একটা মোচড় লাগে অরবিন্দের মনে। তার ওপর আবার সতীনাথের মন্তব্যে চঞ্চল হয়ে ওঠেন যেন অরবিন্দ।

দেখলে ভায়া, আমাদের নবেন্দুও বলছে একথা। রাণী না

থাকলে রাজার রাজত্বও বেমানান। কাজেই বীমা কোম্পানির ম্যানেজারি করে যতো অর্থ সম্পদই তুমি করো না কেন, পাশে বামা না থাকায় সবই অর্থহীন।

এ প্রসংগ থাক এখন, অন্য কিছু বলো।—অল্প কথার মানুষ অরবিন্দ, তাঁর মনের চাঞ্চল্যকে চাপা দিয়ে তিনি থামিয়ে দেন সতীনাথকে এই বলে।

কুইনস পার্ক ও কিংস সার্কেল পার্ক দেখে ওরা আবার ফিরে আসেন বম্বের দিকে। অরবিন্দের বাড়িটা দেখে যায়, নবেন্দুর তাই ইচ্ছে। সতীনাথও তাই চেয়েছিলেন।

আসতে আসতে নবেন্দু তার পলাতক ও স্বাধীন জীবনের অনেক কাহিনীই খুলে বলে। বৃটিশ আমলের গোয়েন্দাদের চোখে ধূলি দিয়ে মুসলমান সেজে মাতুংগা রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ নেবার কথা, আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে সাধারণ কুলি থেকে ইলেকট্রিক অয়্যারম্যানের পদলাভ করার কথা, দেশ স্বাধীন হবার পর কোলকাতা থেকে ঘুরে এসে রুক্মিণীকে বিয়ে করার কথা এবং আরো কতো কি। কিন্তু তার বাবা যে তাকে ত্যাজ্য পুত্র করে গেছেন, উইলে যে তাকে সমস্ত পিতৃসম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গেছেন তার জন্যে একটুও ক্ষোভ বা দুঃখ প্রকাশ পায় না তার কোনো কথায়। তার পিতার মৃত্যুর জন্যে সে-ই নাকি দায়ী। নবেন্দুর মায়েরও সেই ধারণা। কোলকাতায় ফিরে গিয়ে সে তাই মায়ের স্নেহও তেমন পায়নি। কিন্তু তবু সে ভুলেও একবার তার জন্যে আক্ষেপ প্রকাশ করে না এতো কথা সত্ত্বেও। তার মনের এই জোরের জন্যে সতীনাথ মনে মনে প্রশংসা করেন তাকে। নবেন্দুর কথাগুলো অরবিন্দেরও খুব ভালো লাগে। বিশেষ করে সে যখন বলে যে বাঙলা দেশের ছেলেদের এখন আর ঘরমুখো হয়ে থাকলে চলবে না, ভারতময় তাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে, শ্রম ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে তাদের সম্মানের আসন

লাভ করতে হবে—সে কথায় পুরোপুরি সায় দেন অরবিন্দ। প্রাদেশিকতা ও জাতিভেদকে মুছে ফেলতে হবে, এ সিদ্ধান্তকে নিজের জীবনে রূপ দেবার জন্যেই সে বম্বেকে তার বাসস্থান বলে বেছে নিয়েছে এবং মারাঠী কুলির মেয়ে রুক্মিণীকে করেছে তার সহধর্মিনী—নবেন্দু জানায় তার সতীনাথদা ও অরবিন্দকে।

কথায় কথায় গাড়ি কাম্বালা হিলে এসে পড়ে। বেশ খানিকক্ষণ ধরে গান-গল্প ও খাওয়া-দাওয়ার পর নবেন্দু মাতুংগায় ফিরে যায় তার নিজের ঘরে গ্রাণ্ট রোড ষ্টেশন থেকে ইলেকট্রিক ট্রেণে করে।

পরের দিন রবিবার। ছুটির দিন। ছুটির দিনেও অরবিন্দ বড়ো একটা বাইরে যান না। যাদের প্রয়োজন থাকে তারাই বরং তাঁর কাছে এসে ভিড় করে। বাজে লোকের ভিড়কে বিশেষ করে তোষামোদকারীদের অরবিন্দ কোনোদিনই পছন্দ করেন না। তবে কালধর্মে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপারকেই সহ্য করে নিতে হয়, তিনিও করেন। অরবিন্দের ইচ্ছে ছিলো এ রবিবারটা তিনি পুরোপুরি সতীনাথকে নিয়েই কাটাবেন। তাঁকে নিয়ে বাজারে যাবেন, তাঁর ইচ্ছেমতো বাজার করবেন, মনের আনন্দে খাওয়া-দাওয়া হবে আর ছোটবেলার গল্প করতে করতে দিনটা কেটে যাবে। সোমবার থেকে তো আর সতীনাথকে পাওয়া যাবে না। পুণায় তার নতুন অফিসে যোগদানের তারিখ সেদিন। তাই এ রবিবারটা শুধু সতীনাথকে নিয়েই কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে অরবিন্দের।

কি হে, কী মাছ ভালোবাসো বলো। আজ নিজেই বাজারে যাবো ভাবছি তোমায় নিয়ে। সব বাজারে সব রকম মাছ ভালো পাওয়া যায় না এখানে। তাই জেনে নিচ্ছি কী মাছ তোমার পছন্দ। সে বুঝে বাজারের সিলেকশন করতে হবে।—সকালবেলা

ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজতে মাজতেই দিনের প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেন অরবিন্দ।

আরে কি মুস্কিল, মাছ এক রকম হলেই হলো। ও আবার ভালোবাসাবাসির কি আছে?—উত্তর দেন সতীনাথ।

না ভাই, বলোই না।

তা বেশ, বলতেই যখন হবে বলছি। ইলিশ।

ইলিশ! বম্বের ইলিশ কিন্তু আমাদের গংগার ইলিশের মতো নয়। সমুদ্রের ইলিশ। তেমন স্বাদ নেই। অথচ দেখতে বেশ বড়ো বড়ো। এখানে ইলিশকে বলে পালা মাছ। রুইকে বলে রহু। চিংড়িকে বলে ঝিংগা। এ ছাড়া খাজুরি, পমফ্রেট, রাহুশ, বম্বেলি প্রভৃতি নানা রকমের মাছ রয়েছে বম্বের বাজারে। কোলকাতার মতো পার্শে, পুঁটিও পাওয়া যায়। সর্বসাধারণের খুবই প্রিয় মাছ পমফ্রেট। এখন বলো কী মাছ তোমার চাই।

ওরে বাপস, তুমি বড্ডো নাছোড়বান্দা দেখছি। আচ্ছা বেশ তোমার রহু আর পমফ্রেট মাছই আনা যাবে'খন।

তাই ঠিক হয়। সকাল সকাল চা-পান ইত্যাদি সেরে অরবিন্দ বাজারে বেরিয়ে পড়েন সতীনাথকে নিয়ে।

বম্বের সব বাজারেই যে মাছ পাওয়া যায় তা নয়। ক্রেফোর্ড মার্কেট, ধোবিতলাও, চিড়াবাজার, প্যারেল ও নলবাজারেই মাছের আমদানী হয়ে থাকে এবং এ বাজার কয়টিই এ শহরের প্রধান বাজার। মাছের দোকানগুলো কণ্ট্রোল করে মারাঠী মেছুনী মাসিরা। পরিপাটি তাদের সাজসজ্জা। প্রত্যেকেরই নাকে একটি করে চার ইঞ্চি পরিমাপের নথ। তাও আবার হীরে বা মুক্তা বসানো। 'মাসি' ডাকে ভারি খুশি হয় এরা। কৃশাংগী হলেও তর্জন-গর্জনে কিন্তু কোলকাতার মেছুনী রাণীদের চেয়ে কোনো অংশেই কেউ কম যায় না। ঠিক বঁটি না হলেও এক বা একাধিক মারাত্মক দা এবং ছুরি নিয়ে এরা যে রকম মেজাজে দোকানের

উচ্চাসনে বসে হাঁক-ডাক করে তাতে নতুন মানুষের চমক লাগারই কথা।

ইক্রে, ইক্রে।—প্যারেলে মাছের বাজারে ঢুকতেই এক সুসজ্জিতা মেছুনী মাসি দা তুলে হাঁকতে শুরু করে অরবিন্দকে লক্ষ্য করে।

সতীনাথ ভয়ে পেছন থেকে জামায় ধরে টেনে রাখেন বন্ধুকে। কি জানি কোনো পুরোণো ঝগড়ার প্রতিশোধ নিতে চায় নাকি মাসি কে জানে!

না, ভয়ের মোটেই কিছু নেই এতে। মারাঠী ভাষায় ইক্রে মানে এখানে। মেছুনী ডাকছে তাঁদের তার দোকানে।—অরবিন্দ বুঝিয়ে দেন সতীনাথকে।

বাঙালীরা প্যারেল বাজারেই যান বেশি। তার কারণ এ বাজারেই তাঁদের প্রিয় মাছের আমদানী বেশি করে হয়ে থাকে। বম্বেতে গুজরাটী প্রভৃতি কয়েক জাতের লোক মাছ না খেলেও পার্শী, সিন্ধী ও মারাঠীদের মৎস্য-প্রীতি বাঙালীদেরই মতো। তবু বাঙালী বাবুদের ওপরই মেছুনী মাসিদের টান বেশি। তার কারণ বেশি দামের মাছ তারা বাঙালী বাবুদের কাছে যতোটা গছাতে পারে আর কারো কাছে ততো নয়।

তুম্ চা কায় মাওড়া পাইজে? হে বগা চাংলা পালা হেয়। বরফ চা নেহি হ্যায়, তাজা হ্যায়, খেউন যা।—আর এক মেছুনী অরবিন্দকে ডাকে এই বলে।

কিছুই বুঝতে না পেরে বন্ধুকে জিগ্যেস করেন সতীনাথ, মাসি কী বলছে।

মেছুনী মাসির কথা বুঝিয়ে বলেন অরবিন্দ। মাসি বলছে—কী মাছ নেবে? এদিকে এসো, টাটকা ইলিশ মাছ আছে। এ মাছ বরফ দেওয়া নয়, তাজা। নিয়ে যাও।

চ্যাপটা ধরণের বিরাট ইলিশ মাছ। দেখে পছন্দ হয় না

সতীনাথের। তবে বম্বের মাছের বাজারের অবস্থা দেখে অবাক লাগে তাঁর। মুহূর্তে মুহূর্তে ডাক আসে এদিক ওদিক থেকে।

ইক্রে ইয়া এ বগা, এ মাওড়া ঘেউন যা। (এদিকে এসো গো, এই দেখো না, এই মাছ নিয়ে যাও।)

ভালো রুই মাছ চোখে না পড়ায় অরবিন্দ তাড়াতাড়ি করে ক্রফোর্ড মার্কেটে যাওয়াই স্থির করে ফেলেন। প্যারেল থেকে অনেকখানি দূর ক্রফোর্ড মার্কেট, সেই কলবা দেবীর কাছাকাছি। তা হোক গাড়িতে আর কতোক্ষণ।

ক্রফোর্ড মার্কেটের হালফ্যাশানের নতুন তৈরি দোতলা মাছের বাজারে ঢুকতেই অরবিন্দের চোখে পড়ে বেশ বড়ো একজোড়া রুই মাছ। চার পাঁচ সের করে ওজন হবে এক একটির। কিন্তু এতো বড়ো মাছ নিয়ে কীইবা করবেন তিনি। যাকগে, কিছুটা বিলি করে দেওয়া যাবে'খন। অরবিন্দ একটি মাছ নিয়ে নেওয়াই স্থির করে ফেলেন সতীনাথের বাধাকে উপেক্ষা করে। কিন্তু ভাবনা তাঁর দরাদরির ব্যাপার নিয়ে। নিজে বাজার না করলেও মেছুনী মাসিদের বচনের কথা তো তাঁর আর অজানা নয়। দর করতে গেলেই তো গরম হয়ে উঠবে মাসি।

এই ভাবতে ভাবতেই ডাঃ সুরের সঙ্গে দেখা। বম্বেতে প্রায় আজীবন বাসিন্দে ডাঃ সুর। অরবিন্দের বীমা কোম্পানীরও তিনি একজন ডাক্তার। কাজেই তাঁরই ওপর ভার পড়ে দর করে মাছটি কিনে দেওয়ার।

এ মাওড়া চা কায় ভাও? (এই মাছের দাম কতো?)—জিগ্যেস করেন ডাঃ সুর।

সাহা রূপেয়া, ঘেউন যা। (ছয় টাকা, নিয়ে যাও)।—মাসি গুরুগম্ভীর স্বরে দর জানায় মুখটা একদিকে ফিরিয়ে নিয়ে।

অরবিন্দ এবং সতীনাথ দু বন্ধু কথা বলাবলি করেন এই দেখে। তাঁরা উভয়েই ভয় পান এই ভেবে যে, দরাদরি করতে গেলেই

হয়তো তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে। পাঁচ সের মাছ ছটাকা। দর খুব বেশি নয়। অরবিন্দ তাই ডাঃ স্থরকে দরাদরি করতে নিষেধই করেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা তাঁর বম্বের মাছের বাজারের। তিনি কি কারো নিষেধ শুনে চুপ করে যেতে পারেন?

তিন রূপেয়া দিয়াই চা হ্যায়? (তিন টাকায় দেবে?)—ডাঃ স্থরের দর শুনে মাসি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে যেন!

তিন রূপেয়া মাওড়া খাউন আলা! যা—যা—যাঃ। (ওঃ, তিন টাকায় এ মাছ খানেওয়ালা! দূর যাও।)—এর পর কমিনিট ধরে দা হাতে আস্ফালন চলে মাসির। পচা বম্বেলি মাছ দেখিয়ে সে বলে, হে চেউন যা (ঐ মাছ নিয়ে যাও)। শুধু তাই নয়, দু-চার জন সাক্ষীকেও সে জোগাড় করে ফেলে হাঁক-ডাক করে।

ডাঃ স্থর কিন্তু নাছোড়বান্দা। ঘাবড়াবার পাত্র নন তিনি। ঐ গরম আবহাওয়ার মধ্যেও বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছেন তিনি মাসিদের সঙ্গে। মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় বেশ দখল ভদ্রলোকের। তাঁর কথাবার্তা শুনে কে বলবে তাঁকে যে তিনি মহারাষ্ট্রীয় নন। বেশ খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর মাসিকে দেখা গেলো মাছটিকে সে ঠেলে দিচ্ছে ডাঃ স্থরের দিকে। রফা হয়ে গেছে সোয়া তিন টাকায়।

সামান্য চার আনার জন্যে এই লংকাকাণ্ড! সবিস্ময়ে ভাবেন সতীনাথ। কিন্তু এরূপ লংকাকাণ্ড বাধাবারও যুক্তি আছে। নতুন খদ্দের হলে লজ্জায় পড়েই তাকে অনেক বেশি দিতে হতো। কিন্তু এ ঠাঁই বড়ো কঠিন ঠাঁই, মাসি একথা বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। তা ছাড়া বাঙালী খদ্দেরের তেমন ভিড় নেই এটাও সে লক্ষ্য করেছে। বম্বেতে রুই-কাৎলা মাছের খদ্দের কেবল মাত্র বাঙালী।

কিন্তু মাছ তো পাওয়া গেলো, মেছুনী কিছুতেই মাছ কেটে দেবে

না, সেও এক মহা সমস্যা। আবার ডাঃ সুরের সাহায্য নিতে হয়। আবার খানিক কথা কাটাকাটি চলে মাসির সঙ্গে।

থাবাঁ, থাবাঁ, মালা মনুষ্য এউন দিয়া। (থামো, থামো, আমার পুরুষ এসে নিক।)—কেমন একটা তাচ্ছিল্য ভাব, শেষ পর্যন্ত মাসি অবশ্য মাছটা কেটে দিতে রাজি হয়। তবে তার পুরুষের অপেক্ষায় বেশ কিছু সময় কাটাতে হয় ওই মাছের বাজারে। কিছু পমফ্রেট মাছও কিনে নেন অরবিন্দ ওই সময়ের মধ্যে, কিন্তু কোনো দর কষাকষি করতে তার সাহসে কুলোয় না। মাসিদের রণরংগিনী মূর্তিকে তাঁর বড্ড ভয়।

বাজার করে ফিরে আসতে আসতে বেলা হয়ে যায় অনেকখানি। রোদ কড়া হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের জলে রূপালী রোদ ঝলমল করে ওঠে তরংগে তরংগে। মিস সেন তারই দিকে তাকিয়েছিলেন অনেকক্ষণ ধরে, কী ভাবছিলেন একা একা কে জানে। হয়তো কিছুই নয়, আবার অনেক কিছুই হতে পারে। সুধাময়ের রান্নার কাজ এগিয়ে চলেছে। চিকেন পাকাতে ওস্তাদ সে। সেটাও শেষ করে এনেছে প্রায়। কিন্তু মাছের জন্যেই তো যতো দেরী হবার সম্ভাবনা। সায়েবের দেরী দেখে সুধাময় যখন এমনিধারা ভাবছে ঠিক সেই সময়ই কলিং বেল বেজে ওঠে। তখুনি মাত্র মিস সেন হলঘরের কুশন চেয়ারে বসে একখানা রিডার্স ডাইজেষ্ট-এর পাতা ওল্টাতে যাচ্ছিলেন। কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলতেই সামনে দেখেন অরবিন্দ আর তাঁর বন্ধুকে।

সাংঘাতিক বাজার দেখছি। সারা বম্বে শহরকে কিনে নিয়ে এলেন নাকি?—অরবিন্দকে উপলক্ষ্য করে ঠাট্টা করেন মিস সেন।

কিছু মনে করবেন না আপনি। আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি কিছু না বলে পারছিনে। যে বেচারা এতোদিন ধরে বম্বের মতো শহরে থেকেও একটি মাত্র নারীকে তার অধিকারে আনতে পারলো না সে বম্বে শহরকে

হয়তো তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে। পাঁচ সের মাছ ছটাকা। দর খুব বেশি নয়। অরবিন্দ তাই ডাঃ সুরকে দরাদরি করতে নিষেধই করেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা তাঁর বম্বের মাছের বাজারের। তিনি কি কারো নিষেধ শুনে চুপ করে যেতে পারেন?

তিন রূপেয়া দিয়াই চা হ্যায়? (তিন টাকায় দেবে?)—ডাঃ সুরের দর শুনে মাসি একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে যেন!

তিন রূপেয়া মাওড়া খাউন আলা। যা—যা—যাঃ। (ওঃ, তিন টাকায় এ মাছ খানেওয়ালা। দূর যাও।)—এর পর কমিনিট ধরে দা হাতে আস্ফালন চলে মাসির। পচা বম্বেলি মাছ দেখিয়ে সে বলে, হে চেউন যা (ঐ মাছ নিয়ে যাও)। শুধু তাই নয়, দু-চার জন সাক্ষীকেও সে জোগাড় করে ফেলে হাঁক-ডাক করে।

ডাঃ সুর কিন্তু নাছোড়বান্দা। ঘাবড়াবার পাত্র নন তিনি। ঐ গরম আবহাওয়ার মধ্যেও বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছেন তিনি মাসিদের সঙ্গে। মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় বেশ দখল ভদ্রলোকের। তাঁর কথাবার্তা শুনে কে বলবে তাঁকে যে তিনি মহারাষ্ট্রীয় নন। বেশ খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর মাসিকে দেখা গেলো মাছটিকে সে ঠেলে দিচ্ছে ডাঃ সুরের দিকে। রফা হয়ে গেছে সোয়া তিন টাকায়।

সামান্য চার আনার জন্যে এই লংকাকাণ্ড! সবিস্ময়ে ভাবেন সতীনাথ। কিন্তু এরূপ লংকাকাণ্ড বাধাবারও যুক্তি আছে। নতুন খদ্দের হলে লজ্জায় পড়েই তাকে অনেক বেশি দিতে হতো। কিন্তু এ ঠাঁই বড়ো কঠিন ঠাঁই, মাসি একথা বেশ ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। তা ছাড়া বাঙালী খদ্দেরের তেমন ভিড় নেই এটাও সে লক্ষ্য করেছে। বম্বেতে রুই-কাৎলা মাছের খদ্দের কেবল মাত্র বাঙালী।

কিন্তু মাছ তো পাওয়া গেলো, মেছুনী কিছুতেই মাছ কেটে দেবে

না, সেও এক মহা সমস্যা। আবার ডাঃ সুরের সাহায্য নিতে হয়। আবার খানিক কথা কাটাকাটি চলে মাসির সঙ্গে।

থাবাঁ, থাবাঁ, মালা মনুষ্য এউন দিয়া। (থামো, থামো, আমার পুরুষ এসে নিক।)—কেমন একটা তাচ্ছিল্য ভাব, শেষ পর্যন্ত মাসি অবশ্য মাছটা কেটে দিতে রাজি হয়। তবে তার পুরুষের অপেক্ষায় বেশ কিছু সময় কাটাতে হয় ওই মাছের বাজারে। কিছু পমফ্রেট মাছও কিনে নেন অরবিন্দ ওই সময়ের মধ্যে, কিন্তু কোনো দর কষাকষি করতে তার সাহসে কুলোয় না। মাসিদের রণরংগিনী মূর্তিকে তাঁর বড্ড ভয়।

বাজার করে ফিরে আসতে আসতে বেলা হয়ে যায় অনেকখানি। রোদ কড়া হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের জলে রূপালী রোদ ঝলমল করে ওঠে তরংগে তরংগে। মিস সেন তারই দিকে তাকিয়েছিলেন অনেকক্ষণ ধরে, কী ভাবছিলেন একা একা কে জানে। হয়তো কিছুই নয়, আবার অনেক কিছুই হতে পারে। সুধাময়ের রান্নার কাজ এগিয়ে চলেছে। চিকেন পাকাতে ওস্তাদ সে। সেটাও শেষ করে এনেছে প্রায়। কিন্তু মাছের জন্যেই তো যতো দেরী হবার সম্ভাবনা। সায়েবের দেরী দেখে সুধাময় যখন এমনিধারা ভাবছে ঠিক সেই সময়ই কলিং বেল বেজে ওঠে। তখুনি মাত্র মিস সেন হলঘরের কুশন চেয়ারে বসে একখানা রিডার্স ডাইজেষ্ট-এর পাতা ওল্টাতে যাচ্ছিলেন। কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলতেই সামনে দেখেন অরবিন্দ আর তাঁর বন্ধুকে।

সাংঘাতিক বাজার দেখছি। সারা বম্বে শহরকে কিনে নিয়ে এলেন নাকি ?—অরবিন্দকে উপলক্ষ্য করে ঠাট্টা করেন মিস সেন।

কিছু মনে করবেন না আপনি। আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি কিছু না বলে পারছিনে। যে বেচারা এতোদিন ধরে বম্বের মতো শহরে থেকেও একটি মাত্র নারীকে তার অধিকারে আনতে পারলো না সে বম্বে শহরকে

কিনে আনবে, এমন কথা কী করে মনে এলো আপনার আমি তো তাই ভাবছি।—সতীনাথের জবাবে একটু যেন দমে যান মিস সেন।

ও তোমাদের মধ্যে পরিচয় করে দেওয়াটা তো আমারই কর্তব্য। এই যে ভায়া সতীনাথ, ইনিই মিস সেন, 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদিকা। আর ইনি আমার বন্ধু ডক্টর সতীনাথ মিত্র, বিরাট পণ্ডিত লোক যার কথা কাল আপনাকে বলেছিলাম।—এই বলে একটা বিশেষ দায়িত্ব সম্পাদন করেন অরবিন্দ।

আর তুমি না বললেও আমি কিন্তু কালই মিস সেনের কথা অনেক শুনেছি মিঃ নিয়োগীর মুখে।—সতীনাথ বলেন তাঁর বন্ধুকে।

ও তাহলে তো বেশ ভালো করেই আমার মুণ্ডুপাত করা হয়েছে আপনার কাছে।

ছিঃ ছিঃ, এ কি বলছেন মিস সেন! বাঙলা দেশের মেয়ে আপনি বম্বেতে এসে একটা সাময়িক পত্রিকা চালাচ্ছেন, এতো আমাদের প্রত্যেকেরই গর্ব করার কথা। মতের অমিল হওয়ায় মিঃ নিয়োগী আপনার কাগজের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। সেজন্যে আমিই বরং তাঁকে মন্দ বলেছি। দু-চারটে কড়া কথাও শুনিয়েছি।—সতীনাথের কথায় মিস সেন কিছুটা আশ্বস্ত হন বটে, কিন্তু তিনিও যে নিয়োগীর কাজ ছাড়ার কাহিনী তাঁর বন্ধু অরবিন্দবাবুকে বিস্তারিত ভাবে খুলে বলার জন্যেই এসেছেন তা সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেন।

বেশ সব কথাই শোনা যাবে। আপনার মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থাটা এখানেই হোক তাহলে। এতে আর আপত্তি করবেন না মিস সেন।—অরবিন্দ হঠাৎ নিমন্ত্রণ করে বসেন মিস সেনকে। সতীনাথও তাঁর আন্তরিক সমর্থন জানান সে প্রস্তাবে।

কিন্তু আমার হোটেলের মিলটা নষ্ট করে কী লাভ হবে বলুন!

মিল আবার নষ্ট হবে কেন? এখুনি একটা ফোন করে দিন না। একটা কাগজ চালাচ্ছেন তেরশো মাইল দূরে এসে, একথাও আবার বলে দিতে হবে নাকি!—বেশ একটু খোঁচা দিয়েই কথাটা শোনান অরবিন্দ।

শেষ পর্যন্ত তাই হয়। মিস সেন বিকেল পর্যন্ত থেকে যান অরবিন্দের বাড়িতে। নিয়োগী সম্পর্কে অনেক নালিশ চলে। সম্পাদিকার সব কথাই শুনে যেতে হয় অরবিন্দকে। 'ইণ্ডিয়া' কাগজের একজন মস্ত মুরুব্বি তিনি, তাতে আবার তাঁরই লোক সুকমল নিয়োগী। কাজেই নিয়োগী সম্পর্কে যতো নালিশ তাঁর কাছেই আসবে।

আপনি সম্পাদিকা। 'ইণ্ডিয়া' সম্পর্কে আপনার ব্যবস্থাই সব মেনে নেওয়া হবে। তবে একটা কথা আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার। অপরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে এমন কোনো কথা আমাদের কখনোই বলা উচিত নয়।—বিকেলে বিদায় নেবার আগে মিস সেনকে যখন একথা শুনতে হলো অরবিন্দের মুখ থেকে তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর ধারণা হলো যে, সোম সায়েব তাঁর বন্ধুর দিকটা টেনেই এ উপদেশ দিচ্ছেন।

কিন্তু যাই বলো ভাই অরবিন্দ, এমন কিছু তোমার হতে দেওয়া উচিত নয় যাতে 'ইণ্ডিয়া' কাগজখানার কোনো রকম ক্ষতি হতে পারে। তোমার বন্ধু নিয়োগীকেও আমি একথা বলেছি। তোমারও এদিকে একটু নজর দেওয়া দরকার, কেবল সম্পাদিকার ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখলেই 'ইণ্ডিয়া' বাঁচবে না।—সতীনাথের কাছ থেকে সমর্থন পেয়ে মিস সেন প্রথমটায় খুশি হলেও তাঁর শেষ কথায় কেমন যেন একটু শিউরে ওঠেন তিনি। অরবিন্দও বলে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে—এসব আবার কী বলছো তুমি?

আরে ভাই তুমিই আমায় সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত বলে। এই ঘরের আবহাওয়াটুকুই

যদি ঠিক মতো বুঝতে না পারি তাহলে আমার বৈজ্ঞানিক বিদ্যায় দুনিয়ার আবহাওয়া ধরা পড়বে কী করে, আর তোমার কথার সম্মানই বা থাকবে কোথায় ?

অরবিন্দ আর জবাব দেন না সতীনাথের এ কথার। বন্ধুবর দুপুরে খাবার টেবিলে বসে আরো যে দু-চারটে ইংগিত করেছিলেন সেগুলোও মনে পড়ে যায় এ প্রসংগে। 'সুধাময়ের রান্নার স্বাদ আরো দশগুণ বেড়ে যেতো যদি সেখানে থাকতো গৃহিণীর সুপারভিশন'—কথাটা হয়তো নেহাৎ মিথ্যে নয়। অরবিন্দের মনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঘুরপাক খেতে থাকে সতীনাথের এ ধরণের দু-একটি কথা।

জর্জকে ডেকে বড়ো গাড়িটা বার করতে বলেন অরবিন্দ। এ বেলায় হাজার বছরের পুরোণো ক্যানারি কেভস, বম্বের ন্যাশনাল পার্ক প্রভৃতি আরো কতোগুলো দ্রষ্টব্য সতীনাথকে দেখিয়ে আনার কথা। মিস সেনকেও একটা লিফট দিয়ে যেতে হয় তাঁর হোটেলে।

সোমবার পুনার হাওয়া অফিসে সতীনাথের জয়েনিং ডেট। ডেকান কুইন ইলেকট্রিক ট্রেনেই সতীনাথ বম্বে থেকে পুনায় যাবেন প্রথমে কথা হয়েছিলো। কিন্তু অরবিন্দের পরামর্শে শেষটায় মোটর গাড়িতে যাওয়াই স্থির হয়েছে। খুব সকালে উঠেই এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়েন সতীনাথ। অরবিন্দ একজন সঙ্গীও দিয়ে দেন তাঁর সঙ্গে। পরিচিত ড্রাইভার জর্জ তো আছেই।

পুনা আবহাওয়া অফিসের নতুন মেজকর্তা ডেপুটি ডাইরেক্টর সতীনাথ। বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই তাঁর আফিসের দরজায় যেয়ে গাড়ি থামে। আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পাহাড়ী পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে কী ভাবে যে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেছে সতীনাথের তা মোটে খেয়ালই নেই। মহারাষ্ট্রীয় ডাইরেক্টর তাঁর

বাঙালী সহযোগীকে এসে অভ্যর্থনা জানান। সতীনাথ সপরিবারে না আসায় একটু বিস্মিত হন ডাইরেক্টর। স্ত্রীর অসুস্থতা ও ছেলেদের পরীক্ষার অসুবিধের কথা জানান সতীনাথ। মাস দেড়েক পর দিন সাতেকের ছুটিতে যেয়ে সবাইকে নিয়ে আসা হবে সে ব্যবস্থার কথাও তিনি বলেন।

অফিসের তুজন পিয়নকে নিয়ে সতীনাথ চলে যান তাঁর কোয়ার্টারে। ভারি সুন্দর পরিবেশ। পুনার পার্বতী মন্দির একেবারে স্পষ্ট দেখায় তাঁর বাংলোর বারান্দা থেকে। সতীনাথ ভারি খুশি এতে।

মাস দেড়েক পর কোলকাতা থেকে সপরিবারে পুনায় ফেরার পথে পূর্ব কথা মতোই সতীনাথ বম্বেতে অরবিন্দের বাসায় এসে উঠলেন।

এবার সাদর সম্বর্ধনা জানালেন স্বয়ং গৃহকর্ত্রী মিসেস সোম। মিসেস সোম মানে অধুনালুপ্ত 'ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিকের সম্পাদিকা মিস দীপ্তি সেন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম তা ঠিকই হয়েছে তাহলে!

হ্যাঁ, তা হয়েছে।—হলঘরে ঢুকেই তুই বন্ধুতে নতুন প্রসংগ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

কিন্তু এমন একটা কাজ একেবারে নীরবে সেরে ফেললে?

এটাই তো ষ্টাণ্ট ভায়া। আমি যদি আগেই সবটা ফাঁস করে দিতুম তাহলে কি আমায় তুমি এমন কথা শোনাবার সুযোগ পেতে আর কখনো?

তা ঠিক। কিন্তু তোমার চিঠি এইতো সেদিন পেলাম। তাতে তো বিন্দুমাত্র ইংগিত ও নেই এ ব্যাপারে! স্টেশন থেকে এক সঙ্গে এতোটা পথ এলাম। কতো রকমের কথা হলো। আর

এই আসল প্রসংগ একেবারে ধামাচাপা। তাইতো অবাক হয়ে যাচ্ছি, তুমি কী রকম আশ্চর্য লোক ভেবে।

আমায় কিন্তু ভাই আশ্চর্য লোক মনে করার কোনোই কারণ নেই। যে কাজটুকু নীরবে করে ফেলা চলে সেটুকুই শুধু সেরে রেখেছি, বাকিটুকু তোমার অপেক্ষাতেই স্থগিত রাখা হয়েছে।

তার মানে ভূরিভোজনের পুরো পর্বটাই এখনো বাকি রয়েছে বলছো? তাহলে এবার যখন এসেই পড়েছি আর দেরি করে লাভ নেই।—ডক্টর মিত্র এই বলে আনন্দে একেবারে জড়িয়ে ধরে অরবিন্দকে।

ক্রফোর্ড মার্কেটে সেই মাসির কাছ থেকে রুই মাছ কেনার কথা মনে আছে তো? সেবার অতো বড়ো মাছ আনা হলো, সুধাময় এতো করে তোমায় রান্না করে খাওয়ালো, কিন্তু কিছুতেই তোমার সার্টিফিকেট পাওয়া গেলো না। গৃহিণী ছাড়া গৃহের সব কিছুই নাকি বিস্বাদ। বেশ দেখাই যাক না এবার কি দাঁড়ায়।

কী আবার দেখবে? দেখছো না, গৃহকর্ত্রী আসতে আসতেই গৃহের চেহারা কেমন পাল্টে গেছে। হ্যাঁ একটা কথা, তোমাদের সেই 'ইণ্ডিয়া' কাগজখানার খবর কি?—সতীনাথ প্রশ্ন করেন।

'ইণ্ডিয়া' সম্পাদনা করতে বম্বে এসে সম্পাদিকা যে কী মহৎ কাজ সম্পাদন করে বসেছেন তাতো দেখতেই পাচ্ছ। 'ইণ্ডিয়া'র মতো বিরাট ব্যাপারে আর লক্ষ্য রাখা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। তাই আমার মতো ক্ষুদ্রকে পূর্ণগ্রাস করেই তাঁর পরিতৃপ্তি।

সবেমাত্র নিয়োগী এসে উপস্থিত হয়েছেন হলঘরে। অরবিন্দের কথা শুনে সতীনাথের দিকে চেয়ে তিনি শুধু হাসলেন একটু।

ওদিকটায় এতো কিসের ভিড় ?

মনের কৌতূহল মেটাতে বি-ডি-ও তাঁর জীপটাকে স্টেশনের রাস্তার দিকে ঘুরিয়ে নিলেন খানিকদূর।

গ্রামের পথে রেল লাইন বরাবর অনেকখানি এই সদর রাস্তা। মাঝখানে সদাশিবের খাল। খালের জলে শ্যাওলা আর তার মাঝে মাঝে শাপলা ফুল। সকালবেলার সূর্যের সঙ্গে শাপলা ফুলের মন মাখামাখি। চোখ চাওয়া-চাওয়ির নেশা তাদের আর কাটে না যেন। জীপে চড়ে টহলে বেরিয়ে ঐ শাপলা ফুলের দিকেই নজর পড়েছিলো বি-ডি-ওর। আর তা দেখতে গিয়েই চোখ পড়ে যায় ঐ হট্টগোলের দিকে।

খালের ওপর দিয়ে পুল। সে পুল পেরিয়ে গেলেই চন্দ্রগড় স্টেশনের সোজা রাস্তা। সেখান থেকে অল্পই দূর স্টেশন। ভিড়ের কাছে আসতেই বি-ডি-ওর কানে যায় তুমুল তর্কবিতর্ক। ছোট দারোগা কামদাবাবুকে ঘিরে একদল লোকের লম্ফঝম্প দেখে প্রথমে একটু শংকাবোধই করেন তিনি। একবার মনে হলো, কোনো চুরিটুরির ব্যাপার নিয়েই বোধহয় এই বাকবিতণ্ডা। তাঁর হস্তক্ষেপে তাড়াতাড়ি এ গোলমালের একটা মীমাংসাও হয়ে যেতে পারে, এমন কথাও একবার ভাবলেন বি-ডি-ও। তা ভেবেই কামদাবাবুর একরূপ গা ঘেঁষেই এসে দাঁড়ালেন তিনি।

এদিকে ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে হুইসিলের হুঁশিয়ারি। এখনই গাড়ি ছাড়বে। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ লোকই ছুটছাট। ভিড়ের মধ্যে বেশির ভাগই যে ছিলো ট্রেনযাত্রী। সামান্য

দু-চারজন গ্রামবাসীর যা কিছু হম্বিতম্বি সবই ওদের ভরসায়, বি-ডি-ও নিজেও তা বুঝলেন। গাড়ির হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনযাত্রীরা চলে যেতেই বিতর্কের উত্তাপও হঠাৎ পড়ে গেলো। অনেকটা যেন ম্যালেরিয়া জ্বরের সামিল। থার্মোমিটারে ১০৪ ডিগ্রী থেকে হঠাৎ এ যেন একেবারে ৯৭ ডিগ্রীতে নেমে যাওয়ার মতো।

কি নিয়ে এতো হৈ-চৈ হচ্ছিলো, কামদাবাবু?

বি-ডি-ওর গলা শুনেই চমকে ওঠেন ছোট দারোগা। হাতের আধপোড়া সিগ্রেটটা অজ্ঞাতসারে মাটিতে ফেলে দিয়ে মাড়িয়ে দেন বুটের তলায়। থানার বড়োবাবুর বন্ধু যে তিনি। সেই সূত্রে কামদাবাবুও ডাকেন তাঁকে হিতেনদা বলে। অন্তত সামনাসামনি সম্মান দেখাতে কখনো ভুল করেন না।

তাই বেশ মার্জিত ভাষায়ই বিষয়টি সংক্ষেপে বি-ডি-ওকে বুঝিয়ে দিলেন ছোটবাবু। বললেন, ঐদিকে একটু তাকিয়ে দেখুন, তা হলেই মোটামুটি ধারণা করতে পারবেন কি হয়েছে।

হিতেনবাবু দেখলেন, কয়েকজন মেয়েছেলে গোল হয়ে কাপড় দিয়ে ঘিরে রেখেছে খানিকটা জায়গা। কোনো দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই। ব্যাপারটা ঠিক একটা গাছের তলায় হওয়ায় একটু স্বস্তি বোধ করছেন বি-ডি-ও। একটা সন্দেহও তাঁর মনের তলায় উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু সে সন্দেহ যে কতদূর ঠিক তা সঠিকভাবে ঠাহর করতে না পেরে নিঃসংকোচে তিনি জিগ্যেস করেন ছোটবাবুকে, আসলে কী ব্যাপার বলুন তো। মেয়েদেরই কোনো ঘটনা বোধ হয়।

হ্যাঁ হিতেনদা, আর বলবেন না, কোথাকার এক ভিখারিণীর এই খোলা জায়গায়ই প্রসব হয়ে গেলো হঠাৎ।—ছোটবাবুর কথার সুরে কেমন যেন একটু তাচ্ছিল্য। একটু বিরক্তির ঝাঁজও আবার মেশানো তার সঙ্গে। আর ঠিক এই বিষয়টিই অতি বিশ্রী

ভাষায় চিৎকার করে বলছিলেন তিনি একটু আগে। বলছিলেন, হ্যাঁ, কোন মাগী কোথায় বিয়োলো থানার দারোগা তার তদারক করে ফিরবে। ভারি চমৎকার আব্দার!

উত্তেজিত জনতার সঙ্গে তর্ক করতে করতে ছোটবাবুর স্বরগ্রামও উঠে গিয়েছিলো একেবারে সপ্তম সর্গে। তাই তার ঐ শেষ কথার রেশ হিতেনবাবুর কানে গিয়েও পৌঁছেছিলো। তাঁর নিজের প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে ছোটবাবুর চরম উত্তেজনার মুহূর্তে উচ্চারিত বাণীকে মিলিয়ে নিয়ে তর্ক-বিতর্কের কারণ বুঝতে আর বাকি রইলো না বি-ডি-ওর। পুলিসের লোক হলেই তাকে নিষ্করুণ হতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। হিতেনবাবু নিজেও যে জানেন, পুলিসের মহানুভবতার অনেক কাহিনী। হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গিয়ে সেসব কথাই খানিকক্ষণ ধরে ভাবছিলেন তিনি।

চন্দ্রগড়ে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের পদে নতুন নিযুক্ত হয়েছেন হিতেনবাবু। সংগঠনমূলক কাজে বরাবরই তাঁর খুব আগ্রহ এবং আনন্দ। দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সম্প্রসারণ বিভাগের কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত খুশি তিনি। সমস্ত দিকে উন্নয়নের কাজ আশানুরূপ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে না, সেই তাঁর দুঃখ। কী করেই বা তা হবে, জনসাধারণের মধ্যে তেমন উন্মাদনাও জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি এবং সরকারী কর্মচারীদের কর্মশৈথিল্যও নেই এমন নয়। আরও অজস্র অন্তরায় রয়েছে জাতির অগ্রগতির পথে। হিতেনবাবু সেসব নিয়ে অনেক ভেবেছেন, আলোচনা করেছেন বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের নিয়ে, উপরন্থ কর্মচারীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এতো সব করা সত্ত্বেও বিশেষ কোনো যে ফল হয়েছে তা তিনি মনে করেন না। তবু যে তিনি কখনো নিজের কর্তব্যপালনে নিরুৎসাহ বোধ করেন না, তার জন্যেই তাঁকে বাহবা দিতে হয়।

ছোট দারোগাবাবু এবং স্টেশনে উপস্থিত সব লোকজনেরাও

সেদিন কম অবাক হন নি জরুরী কোনো অবস্থায় বি-ডি-ওর কর্মতৎপরতা দেখে।

—এমনি একটা ব্যাপারে কোনটা আপনার কাজ, কোনটা আপনার কাজ নয় তার সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ মোটেই শোভন নয়, কামদাবাবু! এই ঠাণ্ডার মধ্যে খোলা জায়গায় রাস্তার ওপর নিরপরাধ একটি শিশু পৃথিবীর আলো নতুন দেখতে পেলো। আপনার চোখের সামনেই ঘটলো সে ঘটনা। পুলিসের কর্তব্যের কথা নয় বাদই দিলাম, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেও কি সেই নবজাতক ও তার মাকে বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্বের কথা একবারও আপনার মনে হলো না?

এ প্রশ্নে আপনা থেকেই যেন মাথা নুয়ে এলো ছোটবাবুর। হিতেনবাবুও আর কথা না বাড়িয়ে এক দৌড়ে ছুটে গেলেন কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা নতুন শিশুটি ও প্রসূতির খবর জানতে। তাঁর আশংকা, এই ঠাণ্ডায় আর বেশিক্ষণ শিশুটির অন্তত বেঁচে থাকার কথা নয়। তাই অবিলম্বেই একটা কোনো ব্যবস্থা করতেই হবে।

বি-ডি-ও আর মুহূর্তও দেরি না করে সপুত্র ঐ প্রসূতিকে তাঁর জীপে তুলে নিয়ে একেবারে সরাসরি দে-ছুট গান্ধী সেবাশ্রমের ডিসপেন্সারির দিকে। সেই সেবাশ্রম, পাঠাগার ও চিকিৎসালয়ের পরিচালক তাঁরই এককালের সহযোগী। দরকার হলে না হয় তাঁকে একটু পীড়াপীড়িই করা যাবে, তাতে আর কী এমন অপমান হবে তাঁর। কিন্তু খুব সম্ভব কোনোই প্রয়োজন হবে না জোর-জবরদস্তির। গান্ধীবাদী কুমারজীর মনই যে আলাদা! তাঁর আশ্রয়ে একবার এলে ভিখারিণীর কপালই হয়তো কোনো না কোনো রকমে খুলে যাবে।

কুমারজীর সঙ্গে বি-ডি-ওর পরিচয় অনেক কাল আগের। সেই লবণ সত্যাগ্রহের আমলের। একসঙ্গে কারাবরণ করেছিলেন

তাঁরা বন্দাবিলায় সরকারী নির্দেশ অমান্য করে। ব্রিটিশ পুলিসের প্রহারে সে সময় হাসপাতালে প্রাণ হারিয়েছিলো চন্দ্রগড়ের নরেন্দ্র সেন। কুমারজীর প্রাণের বন্ধু নরেন্দ্র। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি কুমারজীর। বন্ধুর স্মৃতিকে তাঁর গ্রামবাসীদের মধ্যে চির-উদ্দীপ্ত রাখার জন্যেই পূব বাঙলার ছেলে কুমারজীর পশ্চিম বাঙলার চন্দ্রগড়ে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা। গান্ধীজীর পুণ্যনামে সেই সেবাশ্রম। সেখানে নরেন্দ্রের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিদ্যালয়। সে বিদ্যালয় আজ প্রাথমিক থেকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত। নরেন্দ্র হাই স্কুলের বালিকা বিভাগও খোলা হয়েছে সম্প্রতি। দেশবন্ধুর নামে পরিচালিত হচ্ছে একটি পল্লী পাঠাগার। গান্ধী সেবাশ্রমের উদ্যোগে আর একটি যে বড়ো কাজ হয়েছে, এ অঞ্চলে তার তুলনা নেই। চন্দ্রগড় দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারা আশপাশের দশ গাঁয়ের মানুষ যে কতো উপকৃত তা আর বলার নয়। কুমারজীকে তাই প্রায়ই গৌরব করে বলতে শোনা যায়, নরেন্দ্রের প্রাণের আলোকে হাওড়া জেলার অন্তত একটি অংশ থেকে অন্ধকার বিদূরিত।

সমাজসেবার জন্যে চিরকুমার থাকার সংকল্প নিয়েছিলেন কুমারজী। কিন্তু সমাজসেবায় নতুন আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশে তাঁকে সেই সংকল্প ভংগ করতে হয়েছে আট বছর আগে। সে আর এক ভিন্ন কাহিনী। তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ বরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করতে গিয়ে বিয়ের আসরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো জয়শ্রী। জ্ঞান ফিরে এলেও সে বিয়েতে আর রাজি করানো যায় নি তাকে। কেউ কেউ আশা করেছিলেন, কোনো না কোনো তরুণ হয়তো এগিয়ে আসবেন তাঁর পাণিগ্রহণে। কিন্তু কেউ আসে নি। চন্দ্রগড় গ্রামের এক উপেক্ষিত অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা যে জয়শ্রী। কে বিয়ে করবে তাকে? শেষ উপায় হিসেবে নিরুপায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কুমারজীর দু হাত গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন সে রাত্রেই। আর কোনো

পথ না থাকায় গোপনে তিনি যে এক বৃদ্ধের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেছিলেন এবং তা যে কিভাবে পণ্ড হয়ে গেলো, তার সব কথাই খুলে বললেন ব্রাহ্মণ। তপোভংগ হলো কুমারজীর। জয়শ্রী হলেন তাঁর সহধর্মিণী—তাঁর কর্মসঙ্গিনী।

বিয়ের পরেও নামের পরিবর্তন ঘটলো না কুমারজীর। কিছু কিছু বিদ্রূপ সমালোচনা এমন কি অসহযোগিতাও আসতে থাকলো সমাজের দিক থেকে। কুমারজী সে সম্পর্কে নীরব, ভ্রূক্ষেপহীন। নিরলস সমাজসেবার কাজে আত্মনিযুক্ত তিনি। স্বর্গত দেশকর্মী বন্ধু নরেন্দ্রের স্বগ্রামকে সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করার সংকল্প নিয়েছেন কুমারজী। সে সংকল্পকে সার্থক করতেই হবে তাঁকে। সে কাজে তিনি আর একা নন। তাঁর প্রধান সহায় শ্রীমতী জয়শ্রী। তা ছাড়া আরও অনেকে।

প্রধানত বেদনাভিভূত জয়শ্রীর একান্ত ইচ্ছে ও প্রেরণারই পরিচয় বহন করছে চন্দ্রগড় দাতব্য চিকিৎসালয়। নিতান্ত সামান্যভাবে শুরু হলেও আজ আর খুব ছোট বলা চলে না সে প্রতিষ্ঠানকে। অচিকিৎসায় একমাত্র শিশুসন্তানকে হারিয়ে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিলেন জয়শ্রী। বিনা চিকিৎসায় আর যাতে কাউকে মৃত্যুবরণ করতে না হয় চন্দ্রগড়ে তারই প্রতিকার-ব্যবস্থা ব্রত হয়ে উঠলো তাঁর। সংসার শুধু স্বামী-পুত্রকে নিয়ে নয়, তার পরিধি আরও বৃহত্তর। সকলকে নিয়ে যে সংসার-বোধ সে বোধেই শান্তি। এমনি একটা ভাবনা পেয়ে বসলো তাঁকে। সাহায্য সংগ্রহ চলতে লাগলো পুরো দু বছর ধরে। জয়শ্রী নিজে নার্সিং শিক্ষা গ্রহণ করলেন কোলকাতায়। একখানি ছাপড়া ঘরে প্রতিষ্ঠিত হলো চন্দ্রগড় দাতব্য চিকিৎসালয়। সে এখন থেকে বছর চার আগের কথা। এই চার বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে ডাক্তারখানার। অনেক ওষুধপত্রের ব্যবস্থা হয়েছে, একজন ডাক্তারও এখন নিয়মিতভাবে রোগীদের দেখে থাকেন রোজ দুবেলা করে। তিন বছর ধরে

সরকারী সাহায্য পাওয়ায় ডাক্তারখানাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনারও সুবিধে হয়েছে। জয়শ্রী তো দিনরাত এই চিকিৎসালয় আর রোগীর সেবা নিয়েই আছেন। কুমারজী তাতে অত্যন্ত খুশি। জয়শ্রীর এই সেবার কাজে তাঁর অসীম আনন্দ।

সেই কুমারজী এই বিপন্ন ভিখারিণীর ও তার শিশুর শুশ্রূষার নিশ্চয়ই কোন একটা ব্যবস্থা করবেন, জয়শ্রী তার পূর্ণ দায়িত্ব নেবেন, সে বিষয়ে এক রকম নিঃসন্দেহ বি-ডি-ও। ভিখারিণীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলতে চলতে এসব কথাই ভাবছিলেন তিনি। কুমারজীর সঙ্গে অনেককাল আগের সামান্য পরিচয়কে সবে ঝালিয়ে তুলেই তাঁর ওপর এমনি একটা ব্যাপার চাপিয়ে দেওয়া কতোটা সংগত হবে সে কথাও যে দু-একবার তাঁর মনে হয় নি তা নয়। কিন্তু গত তিন-চার মাসের মধ্যে কুমারজীর যে পরিচয় তিনি পেয়েছেন এবং কুসংস্কার ও সংকীর্ণতায় আজও গ্রামের মানুষের মন যেভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তাতে এ মেয়েটির আশ্রয় একমাত্র কুমারজী ছাড়া আর কোথায়ই বা প্রত্যাশা করা যেতে পারে?

আরে, আসুন, আসুন হিতেনবাবু! আমারই একদিন যাবার কথা ছিলো আপনার ওখানে, কিন্তু ভাই, সময় করে উঠতে পারি নি। কিছু মনে করবেন না তার জন্যে।—বি-ডি-ওর জীপগাড়ি সেবাশ্রমের প্রাংগণে এসে থামতেই কুমারজী স্বয়ং এসে স্বাগত জানান পুরোনো বন্ধুকে।

না, না, কি আবার মনে করবো। আমি কি জানি না কতো রকম কাজ নিয়ে ডুবে থাকতে হয় আপনাকে। আপনার অতো কাজের কথা জেনেও তার ওপর আবার একটা নতুন দায়িত্ব চাপাতে এসেছি আমি, সে কথাই ভাবছিলাম।

আরে, বলে ফেলুন, বলে ফেলুন। কাজের কথা বলবেন,

তাতে আবার ভাবাভাবির কি আছে?—কুমারজীর গভীর আন্তরিকতায় মনের সামান্য জড়তাটুকুও কেটে যায় বি-ডি-ওর।

বলছি।—এই বলে কুমারজীর কুটিরের বারান্দায় বিছানো মাদুরে বসবার আগেই আসল প্রসংগের ভূমিকা আরম্ভ করেন হিতেনবাবু। বলেন, সমাজে কতো রকমের যে সমস্যা রয়েছে তার বোধহয় কোনো হিসেবনিকেশ নেই, ভাই।

কেন, কি হলো আবার। সমস্যা চিরকালই ছিলো, চিরকালই থাকবে। কিন্তু সমস্যার প্রতিকার না করে তাকে দূরে ঠেলে রাখার চেষ্টা করলে সমাজকে ভুগতেই হবে তার জন্যে। সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিচয়। তার প্রতিবিধানে সমাজের কল্যাণ।

কিন্তু কতো সমস্যার সমাধান করবেন আপনি? এ গ্রামে আপনার পরিচালনায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে বলেই পথ থেকে কুড়িয়ে একটি পেশেন্টকে নিয়ে এলাম। কিন্তু যে গ্রামের আশপাশে কোথাও এ ধরনের ডাক্তারখানা নেই এ অবস্থায় কী করা যেতো সেখানে?

পেশেন্ট। কোথায় সে রোগী? কী রোগ তার?—গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে জিগ্যেস করেন কুমারজী।

সব কথা পরে শুনবেন। আগে দেখবেন আসুন। আমার গাড়িতেই পেশেন্ট।

বারে, গাড়িতেই বসিয়ে রেখেছেন পেশেন্টকে! সে কী কথা? চলুন আগে ডাক্তারখানায় রেখে আসি ওকে। ডাক্তারবাবু এই এখুনি এলেন বলে।—এই বলে কুমারজী ছুটে যান পেশেন্টকে দেখতে। কিন্তু এ কি, এ যে প্রসূতি! সঙ্গে ছোট্ট শিশু!

হ্যাঁ, তাই তো বলছিলাম পথ থেকে কুড়িয়ে আনা পেশেন্টের কথা। শীতের সকালে রাস্তায় হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে এক রকম দিশেহারা হয়েই এদের নিয়ে আসতে হলো আপনার কাছে।

বেশ করেছেন। খুব ভালো করেছেন। বাচ্চাটির আবার নিউমোনিয়া না হয়ে যায়।—কুমারজীর কথায় চিন্তার রেশ। গাড়িতে চেপেই সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টকে নিয়ে তিনি গিয়ে উপস্থিত হন ডাক্তারখানায়। কিভাবে কোথায় কি ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ শুনবেন তেমন সময় নেই কুমারজীর। জয়শ্রীর সময় যেন আরও কম। একটিবার মাত্র হাত তুলে নমস্কার জানানো ছাড়া বি-ডি-ওর সঙ্গে মুহূর্ত দাঁড়িয়ে আলাপের সময় হয়নি তাঁর। কি করেই বা আর হবে। বি-ডি-ওর দুই পেশেন্টকে নিয়েই কি কম হাংগামা? গ্রাম-দেশের কার্তিকে শীতে বাচ্চাটা যে বেঁচে আছে এ অবস্থায় তাই তো আশ্চর্য লাগছিলো জয়শ্রীর। বেঁচে থাকলেও সে একরকম মরারই মতো। সর্বশরীর তার নীল হয়ে গিয়েছিলো একরকম। মুখে কান্নার শব্দটুকু পর্যন্ত নেই। অনেক সেঁকতাপের পর তার দেহে প্রাণের সাড়া। শিশুর আকস্মিক কান্নায় প্রায় অচেতন মায়ের নিমীলিত চোখের পাতাও হঠাৎ খুলে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় কেন মা? অদ্ভুত রকমের একটা প্রশ্ন ধাক্কা দেয় জয়শ্রীর মনকে। তিনিও তো মা হয়েছিলেন। তাঁর হারানো শিশুর স্মৃতিছায়া ছেয়ে ফেলে তাঁর সারা অন্তরকে। তিনিই যে চোখ ফেরাতে পারছেন না এই শিশুটির দিক থেকে। তার মা কি করে পারছে? সে একটা বড়ো প্রশ্ন বই কি!

হয়তো ক্লান্তিই তার কারণ। অবসাদ। প্রসবের পর গ্রামের রাস্তায় প্রায় আড়াই মাইল পথ জীপ গাড়িতে দৌড়ে আসা সে কি বড়ো সহজ ব্যাপার! নবজাতক আর তার মাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে করতে জয়শ্রী ভাবেন এমনিধারা। আসল কথা তো তিনি জানেন না কিছু, কাজেই তাঁর পক্ষে এমনি ভাবাই স্বাভাবিক।

বাস্তবিকই গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বহু দূরে গ্রামের নামে

চন্দ্রগড় স্টেশন। আর ঠিক তার উল্টো দিকে গাঁয়ের অপর সীমান্তে দাতব্য চিকিৎসালয়। অনেকটা পথই বটে। এতোটা পথ জীপ-দৌড়নো যে কোনো প্রসূতিরই পক্ষে শুধু কঠিনই নয়; রীতিমতো বিপজ্জনক। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও যে ছিল না বি-ডি-ওর সামনে।

ইতিমধ্যে বি-ডি-ও সবই বলেছেন কুমারজীকে। স্টেশনের সামনে সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে নিয়ে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় কিভাবে মেয়েটি মাটির ওপর পড়েছিলো সবই জানিয়েছেন। দারিদ্র্য, অসহায়তা সমাজকে কোন পংকে নামিয়ে নিয়ে চলেছে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে উভয়ের মধ্যে। তারপর শিশু ও প্রসূতি দুজনেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, এ সংবাদে খানিক নিশ্চিত হয়ে বি-ডি-ও বিদায় নিয়েছেন।

কুমারজী কিন্তু পুরো নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। পেশেণ্ট সুস্থ হয়ে ওঠবার পরেও যথেষ্ট চিন্তার বিষয় রয়েছে। ভালো হয়ে উঠে কোথায় যাবে ওরা। ডাক্তারখানায় কাউকে রাখার মতো কোনো ব্যবস্থাই নেই। তবু এমনিক্ষেত্রে পেশেণ্টকে কোথায়ই বা ফেলে দেবে? তাই যেমনি হোক সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এদের রাখতেই হবে ডাক্তারখানায়। কিন্তু ভালো হয়ে ওঠার পরেই হবে ওদের নিয়ে গুরুতর সমস্যা। কোথায় গিয়ে উঠবে তারা, সে সমস্যা সমাধানের চিন্তা করতেই বি-ডি-ওকে যাবার সময় একবার বলে দিলেন কুমারজী।

বি-ডি-ও সে ভাবনা নিয়েই ফিরে আসেন। পরদিন সকালে নিজের আফিসের কাজের তাড়ায় সম্ভব না হলেও বিকেলে একটু ফুরসত করে নিয়ে তিনি আবার ডাক্তারখানায় যান ঐ সদ্যপ্রসূত শিশু আর তার মায়ের খোঁজ-খবর নিতে। হাজার হোক তিনিই তো স্বেচ্ছায় ওদের পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ বাঁচানোর প্রথম

চেষ্টা করেছেন। ওরা বেঁচে আছে কিনা, বাঁচবে কিনা তা জানার ইচ্ছে হবে না একটু।

কিন্তু কুমারজীর কথা শুনে বি-ডি-ও অবাক। কেমন অদ্ভুত রকমের একটা অস্বস্তি প্রকাশ করছে প্রসূতি কাল বিকেল থেকেই। 'আমি পালিয়ে যাবো, আমি পালিয়ে যাবো' বলে বার দুই-তিন সে চিৎকার করে উঠেছে তন্দ্রার মধ্যে। প্রথম রাত্রিতে রোগিণীকে পরীক্ষা করে ডাঃ পাল নিজেও কোনো কারণ ঠিক করে উঠতে পারেন নি এ ধরনের অস্বস্তির। একমাত্র যে কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে তা হলো লজ্জায় আত্মগোপনের ইচ্ছে থেকে রোগিণীর মনে পালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠা বিচিত্র নয় মোটেই। এবং সে কথা ভেবেই ডাক্তার বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন প্রসূতি সম্পর্কে। শিশু সম্পর্কেও। আর সেজন্যেই কাল সারারাত জেগে পাহারা দিতে হয়েছে জয়শ্রীকে। অন্য কারোর ওপর এ ভার ছেড়ে দেওয়া চলে না, তাই তিনি নিজেই পাহারার ডিউটিতে রাত কাটিয়েছেন ডাক্তারখানায়।

ভাগ্যি জয়শ্রী নিজেই ছিলেন, তা না হলে কি যে হতো বলা যায় না।

কেন, কি হয়েছে?—বি-ডি-ও বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন জানার জন্যে।

মেয়েটি সত্যি সত্যি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলো ভোর রাত্রে।

তাই না কি। তা হলে তো আপনাদের অনুমানই ঠিক বলতে হয় দেখছি।

বোধহয় তাই। শেষ রাতে জয়শ্রীকে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখতে পেয়ে বিছানা ছেড়ে সে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলো হয়তো। কিন্তু তার চাপা কঁকানির শব্দেই তন্দ্রা কেটে যায় জয়শ্রীর। আর অমনি সে চুপি চুপি সরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

কী সর্বনাশ! পালিয়ে গেলে সত্যি সত্যি তো মুশকিলের ব্যাপার হতো।

তা তো হতোই। তা নিয়ে পুলিসের ঝামেলাও পোয়াতে হতো অনেক, তার ওপর আবার গাঁয়ের লোকের টিটকারিও যথেষ্ট হজম করতে হতো।

বাস্তবিকই তাই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

টিটকারি গালমন্দকে অবশ্য পরোয়া করি না আমি। তবে কোনো ভালো কাজে হাত দিয়ে ব্যর্থ হতে হলে, তার চেয়ে দুঃখের কিছু নেই। মেয়েটির নাম, পরিচয় এখনও কিছুই জানা যায় নি। কাল অনেকবার প্রশ্ন করেছেন জয়শ্রী, কিছুই বলে নি সে। আজ বুঝিয়ে সুজিয়ে বার করতে হবে সে সব কথা।—কুমারজীর একথা শেষ হতেই 'বাপ রে, গেলাম রে' বলে একটা বিকট চিৎকারধ্বনি ওঠে ডাক্তারখানায়। লাফিয়ে উঠে দৌড়ে যান কুমারজী সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে হিতেনবাবুও।

কী হলো, কী ব্যাপার?—ডাক্তারখানায় পা দিয়েই কুমারজীর প্রশ্ন। রোগিণীকে দেখে ডাঃ পাল ফিরছিলেন তখন নিজের আফিস ঘরে। বললেন, ব্যাপার গুরুতর কুমারজী! আসুন, শুনবেন সব।

রোগিণীর নাম জানা গেছে। নাম তার সুষমা দত্ত। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরও অনেক কথা বার করেছেন জয়শ্রী দেবী। তাজ্জব বনে যাবেন সেসব শুনলে।—স্টেথিসকোপটা গলা থেকে খুলে টেবিলে রেখে এই বলে আসন গ্রহণ করেন ডাক্তারবাবু।

আর কি জানা গেছে, শুনি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন, বলুন স্যার, শুনি।—কুমারজীর কথার পিঠে কথা তুলে দিয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন হিতেনবাবু।—বাস্তবিকই প্রথম থেকেই অত্যন্ত বিচিত্র বলে মনে হয়েছে আমার এ ঘটনাটি। এমন সুন্দর একটি মেয়ের এ অবস্থা হতে পারে ভাবতে পারি নি আমি।

সত্যি সত্যি ভাবা যায় না হিতেনবাবু। বড়োঘরের মেয়ে, বড়োলোকের স্ত্রী হয়েও পথে এসে নামতে হয়েছে সুষমাকে, সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে জেনেও তা বিশ্বাস করা কঠিন, এমনি ব্যাপার।—এমনি একটু মুখবন্ধ করে ডাক্তারবাবু সুষমার জীবনের একটি মর্মান্তিক কাহিনীর ছবি তুলে ধরেন কুমারজী ও বি-ডি-ওর সামনে। ডাঃ পাল, বিশেষ করে জয়শ্রী দেবীর সঙ্গে কথায় কথায় সুষমা তুলে ধরেছে তার জীবনের রূপছায়া।

মেদিনীপুর জেলার এক সম্পন্ন তালুকদারের বাড়িতে জন্ম সুষমার। গাঁয়ের স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে বাড়িতে বসেই আরও কিছুদূর অবধি পড়াশুনো করেছিলো সে। একবার পূজা উপলক্ষে তিন দিন ধরে সার্কাস দেখানোর ব্যবস্থা হলো তাদের গাঁয়ে। সুষমার বাবাই ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা। মাঠে তাঁবু পড়লো। হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ দেখার জন্যে সর্বক্ষণ ছেলেবুড়োদের ভিড়। রোজ দুবার করে শো। আশপাশের দশ গ্রামের লোকে মধুডাঙা তিন দিন ধরে লোকারণ্য। গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাসের প্রোপ্রাইটার-ম্যানেজার স্মরজিৎবাবুর থাকার ব্যবস্থা নিজের বাড়িতেই করে দিয়েছেন তালুকদার মশাই। দাদা ও ভাইদের সঙ্গে সঙ্গে সুষমাও লক্ষ্য রেখেছে অতিথির আদর-আপ্যায়নের দিকে। তারই মধ্যে কখন মন দেওয়া-নেওয়া হয়েছে দুজনে কে জানে। কিন্তু সেই পরিচয়েরই পরিণতি পরিণয়ে। সবার অমতেই নাকি সে বিয়ে। পুরুতঠাকুরের মন্ত্র-পড়া বিয়ে নয়, পালিয়ে গিয়ে রেজেস্ট্রি করে মনের মানুষের সঙ্গে আইনসিদ্ধ দেহ-মিলনের ব্যবস্থা। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির মানুষ স্মরজিৎ দত্ত। শুধু স্ত্রী হিসেবে সুষমাকে ঘরে রেখে তৃপ্ত নয় স্মরজিৎ। এমন সুন্দর দেহসৌষ্ঠব, এমন কাঁচা সোনার মতো রঙ, সেই সুষমা যখন আপনা থেকেই জালে এসে পড়েছে তখন ভালো করেই কাজে লাগানো যাক তাকে। সেই মনে করে সার্কাসের রিং-এর খেলা শিখিয়ে নেওয়া

হলো সুষমাকে। তার অদ্ভুত খেলা প্রথম বছর থেকেই প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হলো গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাসের। দুবছর বাদে বম্বে শহরে 'বেস্ট ইণ্ডিয়ান সার্কাস' হিসেবে যে সোনার মেডেল পেলো গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাস তারও বেশির ভাগ কৃতিত্ব এই সুষমার। খেলাটা খুব ভালোভাবে শিখে নিলেও, প্রথম প্রথম খুবই ভয় লাগতো সুষমার সার্কাসে নেমে রিং খেলার কসরৎ দেখাতে। একটু-আধটু লজ্জাও যে লাগতো না তা নয়। খেলতে নেমেই সে অনুভব করতো চারদিকের অসংখ্য দৃষ্টি তার প্রায় নগ্ন দেহকে যেন বিদ্ধ করছে। কিন্তু সমস্ত ভয়-লজ্জা যাতে সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়, সেসব অনুভূতি থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকার জন্যে সার্কাস থেকেই ব্যবস্থা রয়েছে মরফিন ইনজেকশনের। প্রতিদিন সেই ইনজেকশন দিতে দিতে এখন তা দাঁড়িয়ে গেছে এক ভীষণ নেশার মধ্যে। একদিন সে ইনজেকশন না পড়লে উন্মাদ হয়ে যায় সুষমা। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে সে। ডাক-চিৎকার শুরু করে দেয়।

কী ভয়ংকর কথা!—কাহিনীর মধ্যপথেই বিস্ময়ে যেন ভেঙে পড়েন কুমারজী।

বাস্তবিকই, মেয়েছেলের এমনি নেশার কথা কোনোদিন শুনি নি আমি। এ সত্যি অবিশ্বাস্য!—বি-ডি-ওর কথায়ও সেই একই সুর।

কিন্তু এখনও সব কথা শোনেন নি আপনারা। অবাক হবার আরও অনেক কথা আছে। বলছি আস্তে আস্তে, ধরুন, সিগ্রেট খান।—এই বলে পকেট থেকে সিগ্রেট-কেসটা বার করে ডাঃ পাল খুলে ধরেন বি-ডি-ওর সামনে। ধূমপানে কুমারজী অনভ্যস্ত জানাই তাঁর। তবে নিজে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিয়ে ডাক্তার বাবু যেন আরও জোরালো করে বলতে চান গল্পের বাকি অংশটুকু।

বলুন, আর কি জেনেছেন মেয়েটি সম্বন্ধে।—তাগিদ দেন কুমারজী।

কাল রাত থাকতেই নাকি খুব অস্বস্তি দেখা যাচ্ছে সুষমার। সকাল থেকে শুরু হয়েছে তার হাঁকডাক। তারপর তার চিৎকার শুনে আপনারা তো একটু আগেই ছুটে এলেন। কিন্তু তারও অনেক আগে জয়শ্রী দেবী আমায় জরুরী খবর পাঠিয়ে নিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে। প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নিজেই সে একবার বললে, অন্তত দু এম্পুল মরফিন নিতে না পারলে আর বাঁচবে না সে।—বলেই কাঁদতে কাঁদতে একেবারে পা জড়িয়ে ধরলো আমার। তারপর ট্যাঁক থেকে সিরিঞ্জ বার করে দেখিয়ে বললে, ইনজেকশন দেবার জন্যে কোনো ডাক্তারের সাহায্য নেবার আর দরকার হয় না তার। নিজের এ কাজটি নিজেই করে নিতে অনেক দিন ধরেই সে অভ্যস্ত।—বলতে বলতে একটু থেমে যান ডাক্তারবাবু।

তা হলে তো ভীষণ মেয়ে বলতে হয় সুষমাকে।

নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ সার্কাসের প্রয়োজনেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, একটা মারাত্মক নেশার বদ অভ্যাস করে ফেলেছে মেয়েটি।—ডাক্তার আফশোস করেন সে জন্যে।

কিন্তু এ নেশা থেকে কি মুক্ত করা যাবে না তাকে?—কুমারজীর এ প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি বিপথগামিনী মেয়েকে উদ্ধার করার গভীর আগ্রহ।

হ্যাঁ, নেশা থেকে মুক্ত করা যায় বই কি! নিজের চেষ্টায়ই সুষমা নেশার ঘোর অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে, সম্পূর্ণ পারে নি। এর প্রায় সবটাই নিজের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। ডেইলি দশ এম্পুল থেকে দু এম্পুলে নেমে আসা যখন সম্ভব হয়েছে তখন এ নেশা একেবারে ছেড়ে দেওয়া বোধহয় তার পক্ষে অসম্ভব হবে না।

কী বলছেন ডাঃ পাল, দশ এম্পুল মরফিন ইনজেকশন ডেইলি?

ডাক্তারের কথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে বি-ডি-ওর মাথার ওপর।

একথা যে নিজে মুখেই বলেছে সুষমা। কি করেই বা আর তা অবিশ্বাস করি।

যাক এখন ওসব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা। মেয়েটি আর তার শিশুটিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, তাই এখন ভাবনার বিষয়। আর এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তাই হলো সমাজের সামনে একটা বড় সমস্যা।

কিন্তু আপনি যাই বলুন কুমারজী, আমি বলি ধন্যি মেয়ে বটে। তবে এখন তো বেশ চুপচাপ আছে দেখছি।—বি-ডি-ও জিগ্যেস করেন ডাঃ পালকে।

তা তো থাকবেই। মরফিন ইনজেকশন পড়েছে যে। এখন এক রকম নিস্তেজ অবস্থায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে।

তাই থাক খানিকক্ষণ। তারপর দেখা যাবে ওকে বুঝিয়ে সুজিয়ে কতোদূর কি করা যায়। চলুন, এবার ওঠা যাক হিতেনবাবু।—বলেই উঠে পড়েন কুমারজী।

হ্যাঁ, আমারও আবার এখন আফিসের তাড়া। চলুন।—ঘড়ির দিকে একবার নজর দিয়ে কুমারজীর সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ পালকে বিদায় সম্ভাষণ জানান বি-ডি-ও।

যাবার সময় ডাক্তারবাবু শুধু একথাটাই বলে দিয়ে যান তাঁদের, মেয়েটিকে বোঝানোর চূড়ান্ত করছেন জয়শ্রী দেবী।

সত্যি তাই। বলতে গেলে গত দুদিন ধরে এক রকম প্রায় দিনরাতই জয়শ্রী লেগে আছেন সুষমার সঙ্গে। এ রোগিণীর প্রতিটি কাজ করছেন তিনি নিজ হাতে। শিশুটির পরিচর্যাও নিজে না করতে পারলে তাঁর তৃপ্তি নেই। এই শিশুর প্রসংগ নিয়েই তাঁর সঙ্গে কাল রাতে কতো আলাপ হয়েছে সুষমার। তারই

ফল বোধহয় আজ কিছুটা দেখতে পাচ্ছেন জয়শ্রী। দুপুরবেলা সামান্য কিছু খেয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলো সুষমা। কিন্তু সন্ধ্যের পর সুষমাকে ঘুম থেকে জেগেই হঠাৎ বাচ্চাটাকে বুকে টেনে নিয়ে মুখে মাই ধরিয়ে দিতে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন তিনি। একটু দূরে সরে গিয়ে গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন সব। নিশ্চয়ই একটা পরিবর্তন এসেছে সুষমার মনে। ক্রমাগত বোঝানোর ফল কিছু হয়েছে তা হলে।

সন্ধ্যের পর রোগিণীকে খাবার দিয়ে তার সঙ্গে আর এক দফা গল্প শুরু করে দেন জয়শ্রী দেবী। দুদিনেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে সুষমা। খোলাখুলিভাবে দু-চারটে প্রশ্ন করাও বোধহয় চলে এখন। সেসব প্রশ্ন করার আগে তাঁর নিজের কুমারী জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথাও মনে পড়ে যায় জয়শ্রীর। আপন জীবনের আয়নায় সুষমার জীবনকে একবার ভালো করে মিলিয়ে নিতে চান তিনি। সত্যি কথা, কুমারজী যদি এগিয়ে না আসতেন তা হলে কোন অন্ধকারে তলিয়ে যেতে হতো তাঁকে কে জানে! নিরুপায় বাপকে কন্যাদায় থেকে বাঁচাবার জন্যে অপরিচিত এক তরুণের সঙ্গে পালিয়ে যাবার চক্রান্ত করেছিলেন তিনি। সে ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যাবার ফলে বাপ তাঁর তাড়াহুড়ো করে তৃতীয় পক্ষের এক বুড়ো বর ঠিক করেছিলেন তাঁর জন্যে। আত্মীয়স্বজন গ্রামবাসী রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে। সে বিয়ে পণ্ড হয়ে গেলো তাঁদের বিরোধিতায়। কিন্তু গ্রামের কোনো যুবক সেদিন এগিয়ে আসে নি এই বিপন্ন ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণে। সে রাত্রির সমস্ত কাহিনী ছায়াছবির মতো ভেসে ওঠে জয়শ্রী দেবীর সামনে। সে বিপদে যে কুমারজী এসে পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁর, সে তো তাঁর পরম ভাগ্য। তা নাও তো হতে পারতো! কি হতো তা হলে? সে সব কথা ভেবেই সুষমার জন্যে সহানুভূতিতে ভরে ওঠে তাঁর মন। জানতে ইচ্ছে হয়, স্বামীর সংসার ছেড়ে কেন

সুষমা এমনিভাবে এসে পথে দাঁড়ালো। সে কথা তিনি জিগ্যেস করেন সুষমাকে।

সে অনেক কথা দিদি। রাত ভোর হয়ে যাবে সব কথা বলতে গেলে।

খুব সংক্ষেপেই বলো না বোন, কী করে এমন অবস্থায় পড়লে তুমি।—সত্যি ঠিক নিজের বোনের মতোই জয়শ্রীর ব্যবহার সুষমার প্রতি। তাই সে একরকম অসংকোচেই অল্প কথায় খুলে বলে সব কথা।

বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে নয়, তার ব্যবসায়িক উন্নতির যন্ত্র হিসেবেই আমার যা কিছু গুরুত্ব ছিলো আমার স্বামীর কাছে। এমন যে হতে পারে তা আমি ভাবতেই পারি নি আগে। যখন বুঝতে পারলাম, তখন ভুল শুধরে ভালোভাবে বেরিয়ে আসবো সে ব্যূহ থেকে এমন কোনো পথই খোলা ছিলো না আমার সামনে।—এই বলে একটু যেন হাঁফিয়ে পড়ে সুষমা। হয়তো দম নেয় আরো গুরুতর কোনো কথা বলার জন্যে।

কিন্তু তোমার রিং খেলার জন্যে গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাসের এতো নাম হয়েছে, চতুর্গুণ আয় বেড়েছে এসব কথা তো তুমিই বললে কাল। তাই যদি হয়ে থাকে, তা হলে তো স্বামীর কাছে তোমার গুরুত্বও চতুর্গুণ বেড়ে যাবার কথা।

তা বেড়েছিলো বই কি। কিন্তু আমার খেলাও যেমনি বন্ধ হলো, কপালও পুড়লো।

সে আবার কেমন কথা?—সবিস্ময়ে জিগ্যেস করেন জয়শ্রী।

আগেই তো বলেছি, নামে একটা বিয়ে হলেও দত্ত আমায় ঠিক সহধর্মিণী হিসেবে গ্রহণ করে নি। আমায় নিয়েছিলো সে তার সার্কাসে বিনে পয়সার সহকারিণী হিসেবে। আজীবন তার সার্কাসের কাজ করে যেতে পারবো আমি, তাই ছিলো তার ধারণা। বিয়ের সুযোগ নিয়ে আমার দেহের ওপর পূর্ণ অধিকার বিস্তারেও

অবশ্য সে কার্পণ্য করে নি কোনোদিন। এক ডাক্তার বন্ধুর কথায় এবং তাঁর ব্যবস্থাপনায় আরও সে নিশ্চিন্ত ছিলো এ ব্যাপারে।

কি বলেছিলেন ডাক্তার?

বলেছিলেন, ক্রমাগত মরফিন ইনজেকশন দেবার ফলে ছেলেপুলে আর হবে না আমার।

তাই বুঝি খুব নিশ্চিত ভরসায় ছিলো দত্ত? কি হলো তারপর?

ডাক্তারের কথা ব্যর্থ প্রমাণ হলো একদিন। আর তা জানার সঙ্গে সঙ্গেই দত্তর মেজাজও রুক্ষ হয়ে উঠলো ক্রমে ক্রমে। একটি ছেলে হলো আমার। দত্ত নিরানন্দ তাতে। সার্কাসের জন্মে আরও যে দুটি মেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছিলাম আমি, তাদের নিয়ে দত্তর অস্বাভাবিক মাতামাতি আহত করলো আমাকে। আর তাই নিয়ে একদিন তার সঙ্গে আমার ভীষণ কথা কাটাকাটি।

তখনই বুঝি তুমি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এলে রাগ করে? এ কিন্তু আমি বলবো তোমারই অন্যায়।

সব কথা শুনলে আর আমার অন্যায় বলবেন না দিদি।

বেশ বলো।

খানিকক্ষণ তর্কবিতর্ক চলার পর হঠাৎ অত্যন্ত অপমানজনক-ভাবেই দত্ত আমায় বাড়ি থেকে দূর হয়ে যেতে বললে। তারপর আর সে বাড়িতে থাকা সম্ভব ছিলো না আমার পক্ষে। কারো পক্ষেই তা সম্ভব হতো না। সেই মুহূর্তেই খোকাকে নিয়ে সেই যে বেরিয়ে এলাম আর পা বাড়াই নি সেদিকে।

রাগের বশে ঘর ছেড়ে চলে এসেই মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছো তুমি। তারই প্রায়শ্চিত্ত আজ এমনিভাবে ভোগ করতে হচ্ছে তোমাকে। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়, কথা কাটাকাটি হয়, কিন্তু তার জন্মে ঘরছাড়া হয়ে যায় ঘরের লক্ষ্মী, সে কেমন কথা? কোথায় তোমার স্বামীর ঘর? গায়ে পায়ে আর একটু জোর হোক,

তারপর আমিই না হয় নিয়ে যাবো একদিন তোমায় সেখানে।

না, তা আর হয় না দিদি। আমি সে বাড়িতে থাকতেই সেখানে শেষদিকে আর স্থান ছিলো না আমার। কাজেই কোথায় আর যাব বলুন।—বলতে বলতে কেমন একটা কালো ছায়া এসে যেন সারা মুখখানাকে ছেয়ে ফেলে সুষমার। খাওয়াও শেষ হয়ে গেছে তার। তাড়াতাড়ি সে হাত-মুখটা ধুয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

কিছুই চোখ এড়িয়ে যায় না জয়শ্রীর। কথাটা তাই ঘুরিয়ে নেন তিনি। সুষমার জন্যে কয়েকটা রাত তাঁকেও কাটাতে হচ্ছে ডিসেপেন্সারিতে। প্রথম থেকেই যে রকম ভাবভংগি দেখা যাচ্ছে সুষমার তাতে চোখে চোখে রাখতেই যে হবে তাকে।

আচ্ছা, যে খোকাকে নিয়ে তুমি বেরিয়ে এলে বাড়ি থেকে সে কোথায় এখন ? তার বয়েসই বা কতো ?—নতুন প্রশ্ন করেন জয়শ্রী।

বয়েস তার এখন বছর সাতেক। কিন্তু তার সব কথা আপনাকে পরে বলবো। হাতের কাজ সব সেরে আসুন আপনি। শুয়ে শুয়েই কথা হবে।—সুষমার কণ্ঠস্বর কেমন ভারি হয়ে ওঠে জয়শ্রী দেবীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে। ছেঁড়া শাড়ির আঁচলের খুটে চোখের জল মুছতে মুছতে চুপ করে যায় সে।

বেশ, গেটটা বন্ধ করে দিয়ে এসে শুয়েই পড়ি তা হলে। তেমন আর কোনো কাজও নেই আমার আজ। তোমায় শুধু রাতের ওষুধটা দেওয়া বাকি।—বলেই গেটের দিকে এগিয়ে যান জয়শ্রী। গেট বন্ধ করে দিয়ে ওষুধ নিয়ে আসেন সুষমার জন্যে। তারপর হ্যারিকেনের আলোটাকে একটু 'ডিম' ক'রে দিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েন।

দূর মফঃস্বলের গ্রাম। তায় আবার শীতের রাত। অল্প রাতেই যে যার ঘরে লোকজন। এতো সকালে সবাই যে ঘুমিয়ে

পড়ে তা নয়। তবে লেপ-কাঁথার তলায় জড়োসড়ো হয়ে শীতের রাতে গল্প করার মধ্যে যে একটা বিশেষ রোমাঞ্চ আছে তা উপভোগের নেশা আছে অনেকেরই। তারই জন্যে হয়তো শুয়ে শুয়ে গল্প করতে চেয়েছে সুষমা। জয়শ্রী দেবীর তাই ধারণা। তারই বোধহয় জন্যে সাত তাড়াতাড়ি করে তাঁর নিজের শোবার ব্যবস্থা করেছে সে। কিন্তু আসলে তা নয়। বড়খোকার কথা উঠতেই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিলো সুষমার। সে আর বলতে পারছিল না কোনো কথা। তাই একটু সময় নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছিলো তার। মনটাকে সুষমা তৈরি করে নিয়েছে এই অবসরে।

আজ আর ঢেকেঢুকে কথা বলা নয়। অন্তরের গোপনলোকে লুকানো যতো কিছু কথা জয়শ্রীর কাছে উজাড় করে দিয়ে নিজেকে একটু হালকা করে নিতে চায় সুষমা। অন্তত একটি লোকের জানা থাক তার কাহিনী। আর জয়শ্রীর মতো এমন আপনজন আর কোথায় পাবে সে তার জীবনকথা শোনাবার? তাই এক এক করে সুষমা যেন অতীতের নানা ঘটনার একটি প্রদর্শনী খুলে বসে ঐ নিরালা পরিবেশে।

এটি আমার তৃতীয় সন্তান। স্বামীর ঘর ছেড়ে এসেছিলাম বড়খোকাকে কোলে নিয়ে। গহনাপত্র যা কিছু ছিলো কিছুদিনের মধ্যেই তা নিঃশেষ হয়ে গেলে দিশেহারা হয়ে পড়ি আমি। আহার জোটানোই যখন অসম্ভব, তখন মরফিনের খরচ আসবে কোত্থেকে সে চিন্তায় আমি অস্থির। তার ওপর বাচ্চাটাকে বাঁচানোর চিন্তায় উন্মাদপ্রায়। দেখলাম, আর কোনো উপায় নেই। খোকনকে বিক্রি করে দিলাম পঞ্চাশ টাকায় কোলাঘাটে নিঃসন্তান এক গৃহস্থ পরিবারের কাছে।

আহা, বিক্রি করে দিলে কোলের ছেলেটাকে? পরম আশ্রয়কে এমনিভাবে হারালে?

হ্যাঁ।—জয়শ্রীর প্রশ্নের এই ছোট্ট উত্তর দিয়েই জিভ কাটে সুষমা। সে চুপ করে যায় মুহূর্তের জন্যে। এ ঘরে তো শুধু একাই নন জয়শ্রী দেবী। তার মনে হচ্ছিলো ঘরের ক্ষীণ আলোটাও যেন গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনে চলেছে তার প্রতিটি কথা। এমনকি তার নতুন খোকাও। বড়খোকনের বিক্রির কথা জেনে কী ভাবছে এই নতুন শিশু? মনে এই প্রশ্ন দেখা দিতেই সুষমা একবার চোখ ফেরায় নবজাতকের দিকে। তার গায়ের কাঁথাটাকে একটু টেনেটুনে দেয়।

তারপর কি করলে?—জয়শ্রী নীরবতা ভংগ করেন সহসা এই প্রশ্ন তুলে। কোনো কিছুই লক্ষ্য এড়ায় না তাঁর। কিন্তু আরও বিশদভাবে তাঁর জানার ইচ্ছে।

তারপরের কাহিনী অতি করুণ দিদি। কয়েকদিনের মধ্যেই সে টাকাও শেষ। তখন দেহদানের বিনিময়ে বেঁচে থাকা, এ ছাড়া বাঁচবার আর কোনো পথই নেই আমার সামনে খোলা। কেবল আহার জোগানোই তো সব নয় আমার জীবনধারণের জন্যে। আমি যে সার্কাসের মেয়ে! অনেক কমিয়ে আনলেও তখনও দৈনিক অন্তত চার এম্পুল মরফিন আমার চাই-ই চাই। সে চাহিদা আমার যে মিটিয়েছে আমার দেহ তারই ভোগে লেগেছে সেদিনের জন্যে।

কী ভয়ংকর কথা!—জয়শ্রী শিউরে ওঠেন সুষমার কথা শুনে।

সে যে কী ভয়ংকর তা আমার চেয়ে বেশি করে আর কারো তো জানার কথা নয় দিদি! কিন্তু প্রতিদান ছাড়া দয়া প্রত্যাশা একালে বোধহয় সত্যি দুর্লভ। আর এই প্রতিদানের দায় মেটাতে গিয়ে আমারও কি কম দুর্ভোগ। হাওড়া স্টেশনে হঠাৎ একদিন এক দরদী মানুষ আশ্রয়ের আশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এলো আমার সামনে। তাকে খুলে বললাম সব কথা। পেটে তখন আমার আর একজনের সন্তান। কিন্তু তাতেও 'কুছ পরোয়া নেই'

ভাব তার। বেলেঘাটায় একটা ডেরা ভাড়া করে সে নিয়ে রাখলো আমায়। আমার দেহ হলো তার দিনরাত্রির আনন্দের খোরাক। কয়েকটা মাস বেশ খরচপত্রও করলো সে আমার জন্তে। কিন্তু বাচ্চা হবার জন্তে আমায় একটা হাসপাতালে তুলে দিয়ে এসে সেই যে উধাও হলো সে, আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না তার। কোলে একটা শিশু মেয়ে নিয়ে আবার আমি এসে পথে দাঁড়ালাম। এ শিশু যে আমার বাঁচার পথে কতো বড়ো প্রতিবন্ধক তা কয়েকদিনের মধ্যেই টের পেলাম আমি।

তাকেও তাই বিক্রি করে দিলে বুঝি একদিন?—নিবিষ্ট মনে সুষমার কথা শুনতে শুনতে অকস্মাৎ প্রশ্ন করেন জয়শ্রী।

সে আর জিগ্যেস করবেন না দিদি। কি করে সে প্রশ্নের জবাব দেবো আমি, আমি যে মা!—বলেই বুকে জড়িয়ে ধরে তার শিশুকে। কথায় তার বেদনার সুর, অনুতাপের ছোঁয়া। আর কোনো কথা নেই তার মুখে। জয়শ্রীও চুপ করে যান। শিশু মেয়েটা সম্পর্কে সাংঘাতিক একটা অনুমান স্তব্ধ করে দেয় তাঁকে। কিন্তু সুষমার পরিবর্তন আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেন তিনি।

সুষমা বুঝতে পেরেছে তা হলে সন্তানই তার পরম আশ্রয়। এ কয়দিনের চেষ্টা তবে সত্যি সত্যি সার্থক হয়েছে জয়শ্রীর। তাই তাঁর আনন্দ। এর পর নিশ্চয়ই আর পালিয়ে যেতে চাইবে না সুষমা। জয়শ্রী নিশ্চিন্ত। সুষমার বেদনাকাতর কথার মধ্যে মুকুরিত হয়ে ওঠে তাঁর আপন সন্তান হারানোর গভীর ব্যথা। তারই মধ্যে ভাবতে শুরু করেন জয়শ্রী, দুই মায়ের স্নেহকিরণের প্রাচুর্যে সর্বাংগসুন্দর পরিপূর্ণতায় কি ফুটিয়ে তোলা যাবে না এই শিশু কুঁড়িটিকে? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েন।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে জয়শ্রী আরও

বিমুগ্ধ। তখনও ঘুম ভাঙে নি সুষমার। ঘুমন্ত শিশুর দিকে প্রশান্তি ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজেই যেন সে হাসছে একান্তে।

হ্যারিকেনের আলোটা নিভিয়ে দেন জয়শ্রী। একপাট জানালা খুলে দিতেই শিশু সূর্যের নরম আলোয় সারা ঘরখানি হেসে ওঠে।

পানের দোকানটা বেশ জমে উঠেছে কিন্তু।

কৃষ্ণকান্তের পানের দোকান।

এই নামেই দোকানের পরিচয় সারা মাণিকতলা অঞ্চল জুড়ে। কোনো পানের দোকানে লোকের এতো ভিড় হতে পারে, এ ভাবাই যায় না। সময় সময় মনে হয় সারা মাণিকতলাই যেন ভেঙে পড়েছে এই দোকানের সামনে।

বরাত ভালো বলতে হয় কৃষ্ণকান্তের।

জায়গাটাও অবশ্য খুবই ভালো। একেবারে কালী দত্ত ষ্ট্রীটের ওপরে। তার ওপর দোকানের একধারে একটা টি ষ্টল, আর একধারে একটা ছোট্ট গলি। সরু গলির মুখে আবার একটা লাইট পোষ্ট। তাই সন্ধ্যে নামতেই গ্যাসের আলোয় জলুষ বাড়ে কৃষ্ণকান্তের পানের দোকানের।

কিন্তু তা হলেও আরো দুজন তো এখানেই ফেল মেরেছে পানের দোকান চালাতে গিয়ে।

কাজেই কৃষ্ণকান্তের বরাত জোরেই যে এমনি জোর চলেছে তার দোকান, তা স্বীকার না করে আর উপায় কি।

কৃষ্ণকান্ত বলে এ তার বাপ-মায়ের আশীর্বাদ। তাঁরা স্বর্গ থেকে নাকি আশীর্বাদ করছেন তাকে। এ তার একেবারে গভীর বিশ্বাস।

তবে আরও একটা কথা আছে। কী করে মনোরঞ্জন করতে হয় খদ্দেরদের, সে আর্ট কৃষ্ণকান্তের চেয়ে ভালো কজন জানে তা বলা শক্ত।

সাজিয়ে গুছিয়ে দোকান সর্বক্ষণ ফিটফাট রাখা, সব সময় হাসিমুখে কথা বলা খদ্দেরদের সঙ্গে, লোকের মুখ দেখে বুঝে নেওয়া কে কি চায় এবং চটপট তাদের কাজ সেরে বিদায় দেওয়া, এসব নানা কারণেই সবাই খুশি কৃষ্ণকান্তের ওপর। তাইতো এতো ভিড় লেগেই থাকে তার দোকানে।

শুরুতে কিন্তু এমনি অবস্থা ছিলো না মোটেই। বরং প্রথম দিকের হালচাল দেখে অনেকটা হতাশই হয়ে পড়েছিলো কৃষ্ণকান্ত। অনেকে পরামর্শ দিয়েছিলো তাকে দোকান তুলে দিতে। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে ছিলো বলেই সুখের মুখ দেখেছে। লেগে থাকলে মেগে খায় না, এ উপদেশ এখন কৃষ্ণকান্তের মুখেও মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। তার উড়িষ্যার বন্ধু-বান্ধবদের সে অনেক সময়ই একথা বলে। কোথাও কোনো কাজ আরম্ভ করে কিছুদিন না যেতেই তা কেউ ছেড়ে দিলে কৃষ্ণকান্ত ভারি বিরক্ত হয় তার ওপর। তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাই তাকে এই শিক্ষা দিয়েছে।

কটক জেলায় বাড়ি কৃষ্ণকান্তের। খুবই সে কষ্টসহিষ্ণু। ছোটবেলায় বাপ-মা মারা যাবার পর অনেক কষ্টে সে বড়ো হয়েছে। এরপর আর আত্মীয়-স্বজনের ঘাড়ে চেপে থাকা উচিত নয়, এ বুদ্ধি হতেই বাইরে বেরিয়ে পড়ে কৃষ্ণকান্ত।

কোলকাতায় গিয়ে কেউ বসে থাকে না, রুজি-রোজগারের কোনো অভাব হয় না সেখানে, পাড়াপড়শিদের মুখে এমনি সব কথা শুনেই কৃষ্ণকান্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে দেশের যা-কিছু সম্বল সব নিয়ে চলে আসে এই মহানগরীতে।

কিন্তু কোলকাতায় এলেই চট করে কোনো-না-কোনো কাজ জুটে যায়, এ ধারণা যে কতো ভুল তা বুঝতে খুব বেশি সময় লাগেনি কৃষ্ণকান্তের।

বেশ কিছুদিন ঘুরে ঘুরে পুঁজির অংক প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসতেই সাবধান হয়ে যায় কৃষ্ণকান্ত। তখনো যা আছে তাকে মূলধন করেই সে আরম্ভ করে দেয় এই পানের দোকান।

জোর জনযুদ্ধের যুগ তখন। জার্মানীর পতনের পর জাপানের অবস্থাও কাহিল। পাশের চায়ের দোকানে যুদ্ধের আলোচনা ছাড়া আর কোনো কথাই নেই। আর সেই আলোচনা চলতে চলতে অবধারিতভাবেই চলে আসে স্তালিনের প্রসংগ। ব্যস, একবার এলো তো চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সেই আলোচনা।

কৃষ্ণকান্তও ঠিক তাই চায়। কিছুদিন ধরেই সে লক্ষ্য করে আসছে যে, দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে যারা এ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে আসলে তারাই হলো তার বাঁধা খদ্দের। তখনো পর্যন্ত পাড়ার লোকদের কাছ থেকে খুব বেশি সমর্থন পায়নি কৃষ্ণকান্ত। সে তাই দেখলে, এই চায়ের দোকানের খদ্দেরদেরই প্রথমে ভালো করে হাত করতে হবে, তারপরে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরো খদ্দেরের আমদানি হবে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় খেলে গেলো কৃষ্ণকান্তের। স্তালিনের বেশ সুন্দর একখানা ফটো ভালো করে বাঁধিয়ে আনলো সে। সিদ্ধিদাতা গণেশের পাশেই বসালো সেই ফটোকে।

কৃষ্ণকান্তের পানের দোকানে হঠাৎ স্তালিনের ফটো দেখে অবাক হয়ে গেলো কেউ কেউ। কৃষ্ণকান্ত বুঝিয়ে বললে তাদের, জনতার হয়ে জনতার জোরে হিটলারকে যিনি কাবু করলেন তিনিই তো একালের জনগণেশ। তাই আমাদের সেকালের দেবতা গণেশের পাশে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে একালের জনগণেশকে। ভালোই তো করেছি, কী বলেন ?—কৃষ্ণকান্ত আবার পাল্টা জিগ্যেস করে কোনো কোনো খদ্দেরকে।

ভালো করেছ বৈ কি, সারা দুনিয়াকে যিনি হিটলারের উৎপাত থেকে রক্ষা করছেন তাঁকে সম্মান দেখাবে তাতে আবার কোনো প্রশ্ন

ওঠে নাকি।—এই বলে কৃষ্ণকান্তের বুদ্ধির তারিফ করে জনযুদ্ধওয়ালারা।

ব্যাপারটা বেশ জানাজানি হয়ে যায় চার দিকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই।

খদ্দেরের সংখ্যাও ক্রমশই বেড়ে চলতে থাকে কৃষ্ণকান্তের পানের দোকানে। পান-বিড়ি-সিগ্রেট। কৃষ্ণকান্তর দোকান ছাড়া এ কয়টি জিনিষ আর কোথাও যেন পাওয়া যায় না অনেকটা তেমনি অবস্থাই হয়ে ওঠে আস্তে আস্তে।

আরো দুটো পানের দোকান কিন্তু রয়েছে খানিকটা দূরে দূরে। কিন্তু তবুও তার আশ-পাশের লোকরাও আসে কৃষ্ণকান্তের কাছেই পান-বিড়ি-সিগ্রেট কিনতে।

অপর দোকানদাররা সময় সময় বলে কৃষ্ণকান্তকে, এক ফটো বসিয়েই বাজার মাৎ করলে দেখছি। কোনো জ্যোতিষের পরামর্শ নিয়েছিলে, না আর কিছু।

কৃষ্ণকান্ত এসব প্রশ্নের বড়ো একটা উত্তর দেয় না। হেসে পাশ কাটিয়ে যায়। তার মিষ্টি হাসিতে প্রশ্নকর্তারাও কিছু মনে করে না বা অসন্তুষ্ট হয় না, খুশি মনেই বিদায় নেয়।

এমনি ভাবেই অনেকদিন কেটে যায়। দিন নয়, কয়েক বছর।

বেশ চমৎকার চলেছে কৃষ্ণকান্তের পানের দোকান।

সেদিন আনমনে হঠাৎ কোথা থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে সনাতন আচমকা একটা কথা বলে বসে, কৃষ্ণকান্ত ধরতেই পারে না তার সে কথা।

কেষ্ট দা, একটা পান খাওয়াওতো একটা কথা বলি।—আগা নেই গোড়া নেই হঠাৎ কেউ এসে এমনিভাবে কিছু বললে অবাক না হয়ে আর উপায় থাকে কোনো?

সনাতনের কথায় কৃষ্ণকান্তেরও হয়েছে সেই অবস্থা। অস্ত

লোক হলে কোনো পাত্তাই দিতো না কৃষ্ণকান্ত তাকে। কিন্তু সনাতন শুধু এক গাঁয়ের লোকই নয়, সে তার জ্ঞাতি ভাই। তাছাড়া বাপ-মা মারা যাওয়ার পর সে সনাতনদের বাড়িতেই মানুষ হয়েছে। কাজেই তাকে তো আর একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

একটা পান খাবি তো তাতে আর এমন কি আছে? আসল কথাটা কি তাই বলনা!—প্রশ্নের আকস্মিকতায় অবাক হলেও কৃষ্ণকান্ত সত্যিকারের ব্যাপারটা কি তা জানতে চায় সনাতনের কাছ থেকে।

ততোক্ষণে একটা পানের খিলিও তৈরি করে ফেলে কৃষ্ণকান্ত। লাল, সাদা, গোলাপী নানা রকমের গন্ধ মশলাতো আছেই, তার সঙ্গে আবার খানিকটা জরদা জুড়ে দিয়ে বাহারি একখিলি পান তুলে দেয় সে সনাতনের হাতে।

নে, দু আনা দামের এক খিলি পান খেয়ে দেখ পান কাকে বলে। কৃষ্ণকান্তের পানের দোকান কেন চলে আর অন্য দোকান কেন উঠে যায় তা হলেই বুঝবি।

এবার বল দেখি তোর কি কথা।—সনাতনের বক্তব্য শোনার জন্যে বিশেষ আগ্রহ কৃষ্ণকান্তের। তার জন্যেই তো দু আনা খিলির পান খাইয়ে তাকে খুশি করার এতো চেষ্টা।

হ্যাঁ, শোনো তা হলে।—সনাতন পানটা মুখে পুরে দিয়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলতে শুরু করে।

যা বলার ধীরে-সুস্থেই বলো।—কৃষ্ণকান্ত তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করে।

তখন অনেক রাত। দোকান বন্ধ করার উদ্যোগ করছিলো কৃষ্ণকান্ত। খদ্দের নেই। সেই সুযোগে ঘরোয়া কথা বলারও সুবিধে। পুরোপুরি সে সুযোগই নেয় সনাতন।

কথাটা খুবই গুরুতর কেষ্টদা, তাই এতো রাত করেও তোমার

কাছে ছুটে এসেছি। হোটেলের বাবুরা আজ খুব তর্ক করছিলেন, স্তালিনের কথা নিয়ে।—স্তালিনের ফটোর দিকে আংগুল দেখিয়ে বলে সনাতন।

তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

তোমার সঙ্গে নয় কেষ্টদা, তোমার দোকানের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্ক আছে সে তর্কের।

কী করে?

কি করে তাই বলছি তোমায়। গণেশ ঠাকুরের পাশে ঐ যার ফটোখানা বসিয়েছো না তাঁর নিজের দেশেই তাঁর ফটো তাঁর দেশের লোকেরা তাঁর দলের লোকেরা আজ এক এক করে সরিয়ে ফেলছে। সেই ফটো এখনো অমন সুন্দর করে সাজিয়ে গুজিয়ে বসিয়ে রাখলে দুদিন পর আর তোমার দোকান চলবে ভেবেছো? যে খদ্দেরদের খুশির জন্যে এ ফটো-দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছো তাঁরা চটে যাবেন না!

কথাটা ভাববার মতোই বটে! কৃষ্ণকান্ত একটু মাথা নাড়ে। কিন্তু তবু মৌখিক সাহস দেখিয়ে সে বলে, অতো ভয় করে চলতে গেলে কি আর ব্যবসা করা যায় রে। কখন কি হুজুগ উঠবে কিংবা কোথায় কে কি বললে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সে অনুযায়ী দোকান সাজাতে হবে, এ রকম অবস্থা হলে দোকানপাট তুলে দিয়ে অন্য কিছু করাই ভালো।

তা তুমি যা ভালো বুঝবে তাই করবে। তোমার ব্যবসা—কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তুমিই ভালো জানবে। ক্রুশেভ না কে একজন স্তালিনকে নাকি কষে গালাগালি দিয়ে দলের লোকদের কাছে বক্তৃতা দিয়েছেন। তা নিয়েই আমাদের হোটেলের বাবুদের মধ্যে খুব তর্ক হচ্ছিলো। রাত্রিতে খাবারের টেবিলে বসে বেশ জমে উঠেছিল তর্ক। তাই শুনছিলাম আর তোমার দোকানের এই স্তালিনের ছবির কথা কেবলই মনে

হচ্ছিলো। তাই বলতে ছুটে এসেছিলাম। বলে গেলাম। এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।—এই বলে বিদায় নেয় সনাতন। এতোক্ষণে হয়তো আবার ম্যানেজারের হাঁকডাক শুরু হয়ে গেছে তার জন্যে।

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে পাচকের কাজ করে সনাতন। প্রায় বছর তিন হলো সে আছে সেখানে। খুব বেশি দূর নয় কৃষ্ণকান্তের পানের দোকান থেকে সে হোটেল। বড়ো জোর মিনিট পাঁচের পথ। প্রায় রোজই সনাতন একবার করে আসে তার কেষ্টদার পানের দোকানে। তবে এ সময়ে কোনো দিনই আসে না। এ ব্যাপারটাকে নেহাৎ জরুরী মনে করেই সে এসেছিলো।

যাই হোক, সনাতন চলে যাবার পর সত্যি সত্যি কেমন যেন একটা ভাবনা কেবলি কিলবিল করতে থাকে কৃষ্ণকান্তের মগজে। বিষয়টা মোটেই উপেক্ষার নয়, এমন একটা ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হয়ে ওঠে তার মনে।

দোকান বন্ধ করতে করতে মনে মনে একটা প্ল্যানও এঁটে ফেলে কৃষ্ণকান্ত। পরদিন থেকেই সে প্ল্যান অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করবে সে, তেমন একটা সিদ্ধান্তও করে ফেলে।

একর্ডিং টু প্ল্যানই কাজ এগিয়ে চলে কৃষ্ণকান্তের। ঠিক পরদিন থেকেই নয়, আরো একদিন পর থেকে।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে যায়।

হঠাৎ একদিন একটা পরিবর্তন নজরে পড়ে কৃষ্ণকান্তের পুরোনো পেট্রনদের একজনের। দেখে চমকে ওঠে সে।

একি কেষ্ট, স্তালিনের ছবিখানাকে সিগ্রেটের প্যাকেট দিয়ে একদিক প্রায় চেপে দিলে দেখছি!

তা আর কি করবো বলুন বাবু, স্তালিন যে দেশের জনগণেশ ছিলেন সে দেশের জনতাই যখন তাঁকে সরিয়ে ফেলছে সব জায়গা

থেকে তখন তাঁকে নিয়ে আমাদের দেশে বাড়াবাড়ি করা আর কি ঠিক হবে? তাই এখন একটু চেপেচুপে রাখাই ভালো, কী বলেন বাবু? তা ছাড়া মানুষকে ঠাকুর দেবতা বানানোটা বোধ হয় ঠিকও নয়, তাই না বাবু?

কেষ্ট, আজকাল তুমি বেশ কথা বলতে শিখেছো। ব্যবসার লাইনে বেশ ভাবতেও শিখেছো দেখছি। তা বেশ।—আর বেশি কিছু না বলে পেট্রন তার নিঃশেষিত প্রায় সিগ্রেটটায় আর একটা টান দিয়ে ফেলে দেয় ফুটপাতে, তারপর পায়ের তলায় জ্বলন্ত সিগ্রেটের টুকরোটাকে দলে দিয়ে আবার গিয়ে বসে চায়ের আড্ডায়।

চায়ের আড্ডায় এ ব্যাপার নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা চলে। তবে সে আলোচনার জের আর বেশি দূর গড়ায় না।

কোথায় আবার গড়াবে? সত্যিতো ক্রুশেভের বক্তৃতার পর সব দেশেই কেমন যেন একটা গা মোড়ামুড়ি দেখা দিয়েছে। কৃষ্ণকান্ত বেচারার দোষ কি?

মাঝে কয়েকটা দিন সনাতন আসতে পারেনি কৃষ্ণকান্তের পানের দোকানে। ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে পড়েছিলো সে।

অসুখ থেকে ভালো হয়ে উঠে বিকেল বেলা বেড়াতে বেড়াতে পান খেতে এসে একটু দাঁড়িয়েই হো হো করে হেসে ফেলে সনাতন।

কী হলোরে সনা? এতো হাসি কিসের?

তুমি আবার তা জিগ্যেস করছো কেষ্টদা। কোথায়, তোমরা স্তালিনকে তো আর দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না।

হ্যাঁ ভাই। ভেবে দেখলাম, আগে থেকে সাবধান হওয়াটাই ভালো। পালের নৌকো হাওয়ায় বয়। আমার পানের দোকানও হাওয়ায়ই চলুক। জনগণেশের দরকার নেই, আপাতত আমাদের সিদ্ধিদাতা গণেশই মাথায় থাকুন। কি বলিস?—পান সাজতে সাজতে বলে কৃষ্ণকান্ত।

ঠিকই বলেছ কেষ্টদা। এমনি না হলে কি আর কৃষ্ণকান্ত মহাস্তি হওয়া যায় কখনো?—সনাতন বুদ্ধির তারিফ করে তার কেষ্টদার।

কৃষ্ণকান্ত একখিলি পান সনাতনের হাতে তুলে দিয়ে টুক করে নিজের মুখেও একটা পুরে দেয় কোনোরকমে। তারপর একটু নড়েচড়ে বসে।

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্য কোনো খদ্দের ছিলো না দোকানে।

॥ সমাপ্ত ॥